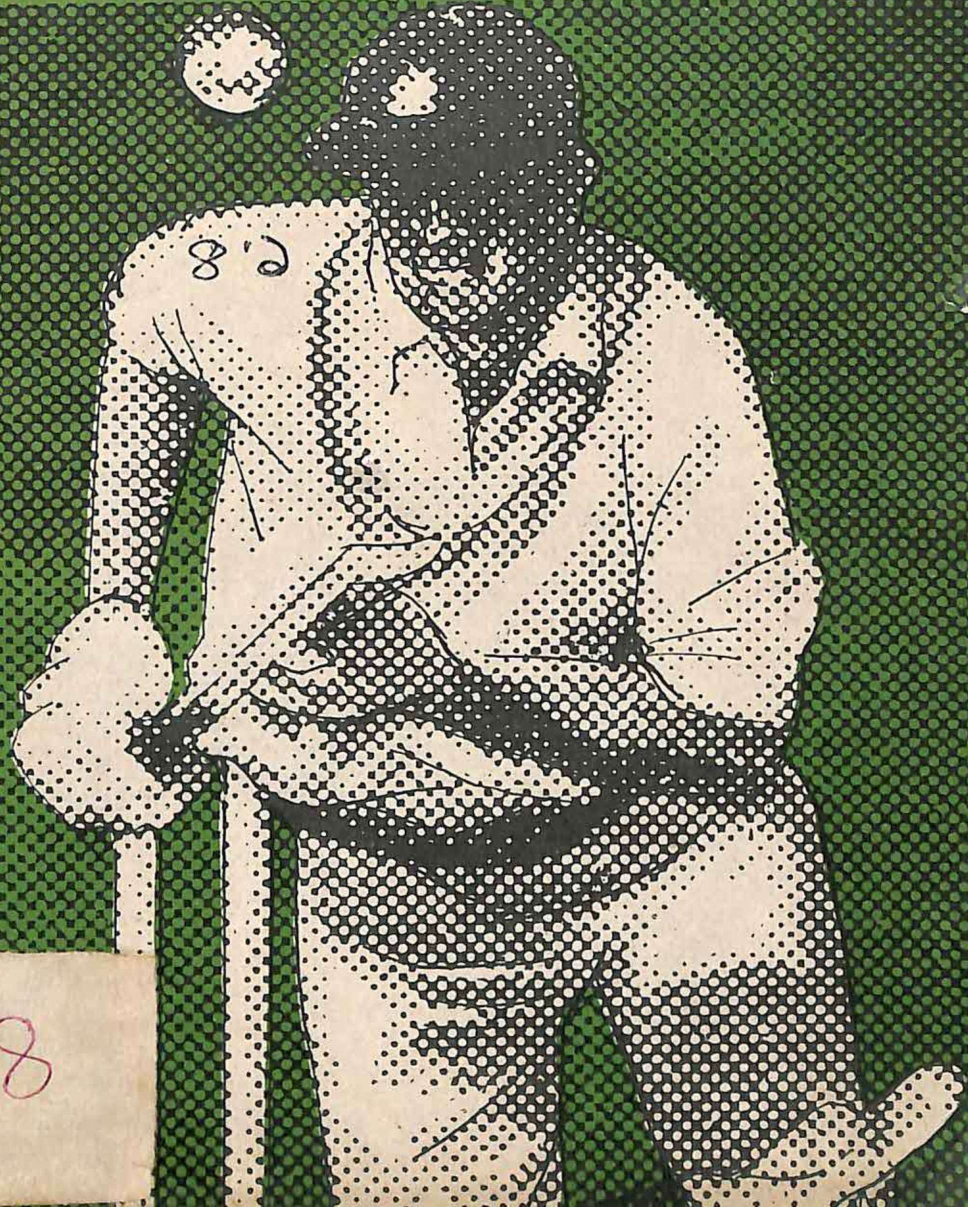
NEHRU
BAL PUSTAKALAYA

নেহরু বাল পুস্তকালয়

বিজয় মার্চেণ্ট

ক্রিকেট



1979 (Saka 1900)
1982 (Saka 1904)

© বিজয় মার্চেন্ট, 1975

বাংলা অনুবাদ © ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, 1979

Cricket (*Bengali*)

National Book Trust, India
REVISED PRICE Rs.5.00

PUBLISHED BY THE DIRECTOR, NATIONAL BOOK TRUST, INDIA, A-5, GREEN PARK, NEW DELHI-110016 AND PRINTED AT SHUCHI PRIVATE LIMITED 1-E, JHANDEWALAN, RANI JHANSI ROAD, NEW DELHI-110055.

নেহরু বাল পুস্তকালয়—36

৪'৯

১০৫৬

ক্রিকেট

বিজয় মার্চেণ্ট

অনুবাদ

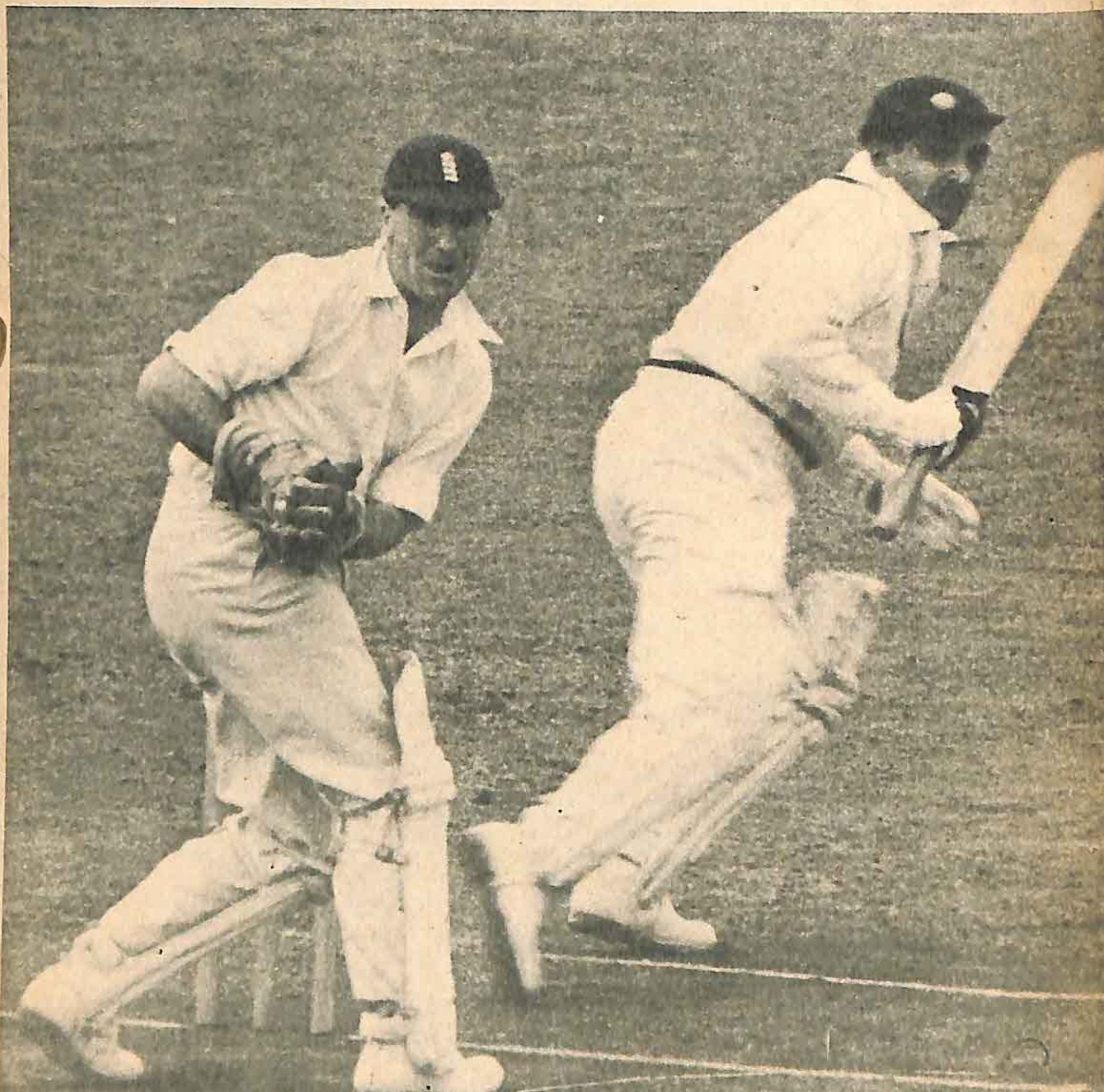
রমেন মজুমদার

Library

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

নয়াদিল্লি

LIBRARY
Date........
Accn. No........



মার্চেন্ট ব্যাট করছেন

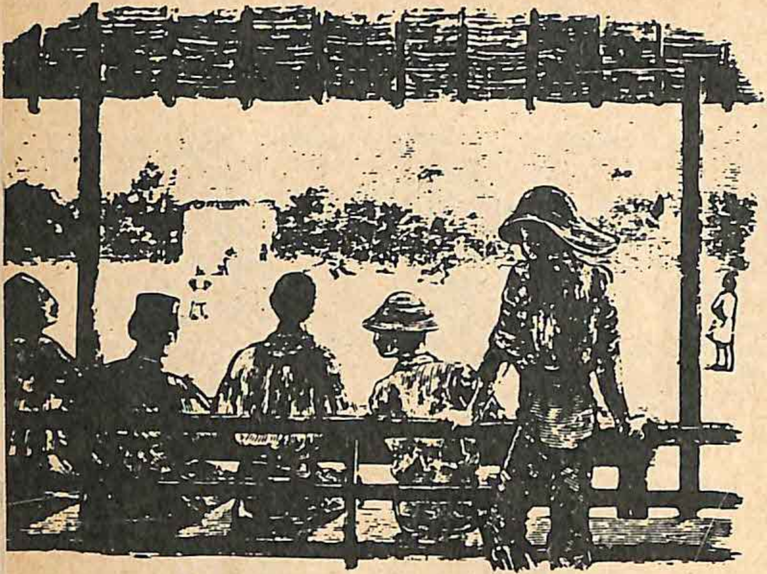


খেলা

ভারতে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে সেই 1721 সাল থেকে। ক্রিকেট একটা কমনওয়েলথ খেলা। বৃটিশরা যেখানে যেখানে রাজত্ব করেছে, সেখানে সেখানে তারা এই খেলা চালু করেছে। ভারতে প্রথম যারা ক্রিকেট খেলে তারা হচ্ছে পারসী। সে 1848 সালের কথা। 1892 সালের মধ্যে তারা এই খেলায় এমনই পারদর্শী হয়ে উঠল যে, প্রেসিডেন্সি ম্যাচ শুরু হয়ে গেল। প্রেসিডেন্সি ম্যাচ খেলা হ'ত ইয়োরোপীয় আর পারসীদের মধ্যে। প্রতি বছরই পুণা আর বোম্বাইয়ে এই ম্যাচ খেলা হ'ত। তারা এই খেলায় প্রচুর উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল।

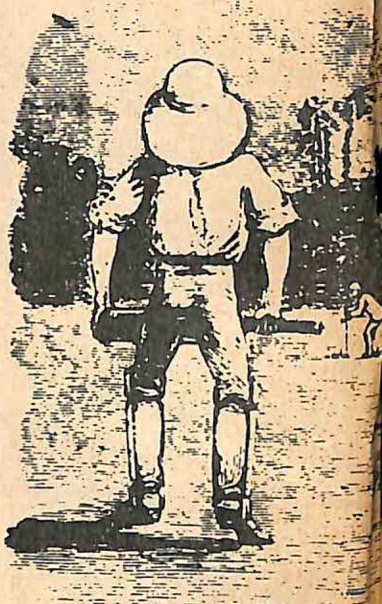
আস্তে আস্তে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও ক্রিকেট খেলায় আগ্রহী হয়ে উঠল। 1907 সালে আর-একটি দল এই খেলার জগতে প্রবেশ করল। তারা হিন্দু। তাদের দল হ'ল তৃতীয় দল। এইভাবে ত্রিদলীয় টুর্নামেন্ট শুরু হ'ল।

CRICKET IN BOMBAY IN OLDEN TIMES



The scoring Table

Going in

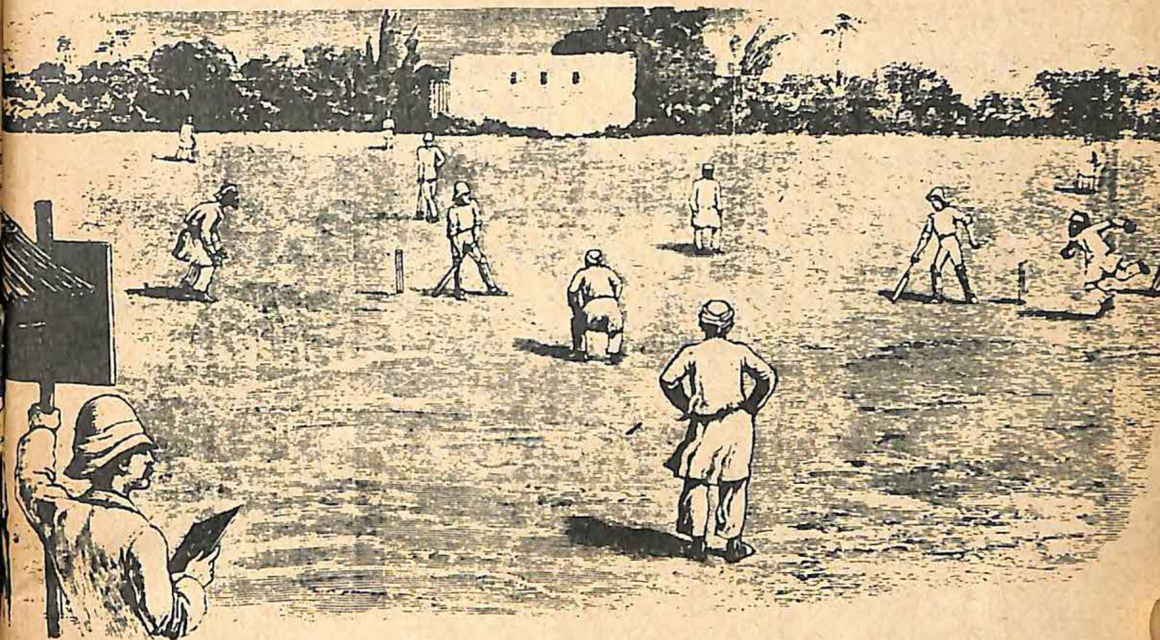




A Parsee Cricketer



Coming out



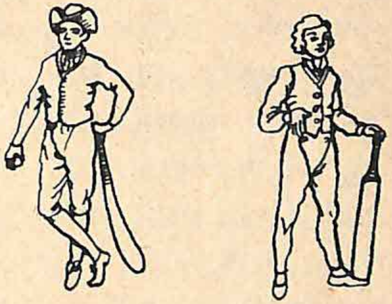
1878 সালে বোম্বাইয়ে ক্রিকেট খেলা

প্রথমে দু দলের মধ্যে খেলা হ'ত। এই দু দলের মধ্যে যারা জিতত তারা অবশিষ্ট দলের সঙ্গে খেলত। ত্রিদলীয় টুর্নামেন্ট শুরু হবার পর থেকে আর পুণায় খেলা হ'ত না, হ'ত বোম্বাইয়ে। বোম্বাই তখন ভারতীয় ক্রিকেটের আবাস হয়ে দাঁড়াল। তবে এর কিছু ব্যতিক্রমও আছে। 1922 আর 1926 সালে যে চতুর্দলীয় খেলা হয়েছিল, সে হয়েছিল পুণায়। চতুর্থ দল ছিল মুসলিম দল। তারা এসেছিল 1912 সালে। তারা আসার পরই চতুর্দলীয় টুর্নামেন্ট শুরু হ'ল। এবং শেষে 1937 সালে ইহুদী, ভারতীয় খৃস্টান প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও এসে যোগ দিল। শুরু হ'ল পঞ্চদলীয় টুর্নামেন্ট। এই সময় বোম্বাইয়ে ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামের উদ্বোধন হয়। এই ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামেই দেশের বেশির ভাগ টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয়েছে।

শিগ্‌গিরই কলকাতা আর মাদ্রাজও এগিয়ে এল। গত কয়েক বছরে দিল্লী আর কানপুরও ভারতের টেস্ট ক্রিকেটে তাদের স্থান করে নিয়েছে। এখন যখনই আমাদের দেশে টেস্ট ম্যাচ খেলা হয়, বোম্বাই, কলকাতা আর মাদ্রাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। যদি পর পর পাঁচটা টেস্ট ম্যাচ থাকে তাহলে বাকি দুটো খেলা হয় দিল্লী আর কানপুরে।

যদিও ক্রিকেট আমাদের কাছে একটা বিদেশী খেলা, তবু এখন এই খেলা আমাদের কাছে একটা জাতীয় খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত তিন বছরে আমরা এই খেলার প্রায় মাথায় পৌঁছে গেছি—এবং ক্রিকেট আমোদীদের বিশ্বাস, আমরা আরও কিছু কাল সেখানে থাকব।





সাজসরঞ্জাম

ক্রিকেট প্রধানত ব্যাট আর বলেরই খেলা। কিন্তু ভালোভাবে খেলতে গেলে আরও অনেক সাজসরঞ্জাম দরকার হয়। সবাই জানে. এগারজনের এক-একটা দল করে দু দলে এই ম্যাচ খেলা হয়। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলতে গেলে অন্তত তিন দিন তা খেলতে হয় এবং যে দেশে এই ম্যাচ খেলা হয় সেই দেশের মূল ক্রিকেট সংস্থার কাছ থেকে এই ম্যাচকে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ বলে স্বীকৃতি পেতে হয়।

ক্রিকেটের মাঠ এবং খেলার পিচ সাধারণত ঘাসে ঢাকা হয়। তাকে টাফ বলে। কিন্তু যেখানে আবহাওয়ার দরুণ কি অন্য কোনো কারণে টাফ উইকেট তৈরি করা যায় না সেখানে মাটির ওপর নারকোলের ছোবড়ার কি পাটের ম্যাট বিছিয়ে দিয়ে শক্ত করে পেরেক ঠুকে দেওয়া হয়।

ক্রিকেট খেলায় সবচেয়ে দরকারি উপকরণ হচ্ছে ব্যাট আর বল। ব্যাটটা চওড়ায় সওয়া চার ইঞ্চির বেশি হওয়া উচিত নয় আর লম্বায় আটত্রিশ

ইঞ্চির বেশি না। খেলোয়াড়ের এমন ব্যাট বাছাই করা উচিত, যা সে সহজে চালাতে পারে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, খেলোয়াড় যখন খেলবে, ব্যাটটাকে তার নিজেরই একটা অঙ্গ বলে মনে হবে। খেলোয়াড় তার খেলা অনুযায়ী ভারী ব্যাটও ব্যবহার করতে পারে. আবার হালকা ব্যাটও ব্যবহার করতে পারে এবং লম্বা হাতলওয়ালা ব্যাটও ব্যবহার করতে পারে, আবার খাটো হাতলওয়ালা ব্যাটও ব্যবহার করতে পারে। লম্বা হাতল কি খাটো হাতলের ওপর ব্যাটসম্যানের স্ট্রোক নির্ভর করে না। সাধারণত লোকের একটা ধারণা আছে যে, যারা বল লেট-কাট করে কি স্কোয়ার-কাট করে অথবা হুক করে তাদের খাটো হাতল দরকার হয় এবং যারা উইকেটের সামনে ড্রাইভ দেয় তাদের লম্বা হাতল দরকার হয়। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়।

ম্যাচ খেলার আগে নতুন ব্যাটকে ভালো করে তেল খাওয়াতে হয় আর পাকিয়ে নিতে হয়। এই পাকিয়ে নেওয়াকে সীজন করা বলে। সীজন করা মানে ব্যটের সমস্ত জায়গায় অনেকবার করে আঘাত করা। ব্যাটের ওপর হাতুড়ি ঠোকার মতো বল ঠুকে ঠুকে কিংবা কোনো বোলারকে অল্প দূরত্ব থেকে বল করতে বলে এই সীজন করা হয়। বারবার তা করতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত-না ব্যাটের ওপরটা এমন শক্ত হয়ে যায় যে, তা নতুন বলের কঠিন আঘাত সহ্য করতে পারে।

বলের ওজন সাড়ে পাঁচ আউন্সের কম ও পৌনে ছ আউন্সের বেশি হওয়া উচিত নয়। বলের পরিধি $8\frac{13}{16}$ ইঞ্চির কম হলে চলবে না, আবার 9 ইঞ্চির বেশি হলে হবে না। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সাধারণত 75 ওভারের পর একটা নতুন বল ব্যবহার করা হয়।

ব্যাটসম্যানের পা দুটোকে বলের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য লেগ-গার্ড ব্যবহার করা হয়। এই লেগ-গার্ডকে আবার প্যাডও বলে। তারপর গ্লাভস্ অর্থাৎ দস্তানা আছে, পেট বাঁচানোর জন্য অ্যাবডোমেন- গার্ড আছে। কোনো কোনো ব্যাটসম্যান আবার উরুতে থাই-প্যাডও ব্যবহার করেন। ব্যাটসম্যানকে অ্যাবডোমেন-গার্ড পরতেই হয়। অ্যাবডোমেন-গার্ড আর থাই-গার্ড দুই-ই ট্রাউজারের তলায় পরে। যে সব জায়গায় উইকেটে বল উঁচুতে উঠে যায় সেইসব

জায়গায় কোনো কোনো উইকেট-কীপার আর ব্যাটসম্যান উইকেটে বুক বাঁচানোর জন্য চেস্ট-প্রোটেকটরও ব্যবহার করে থাকেন।

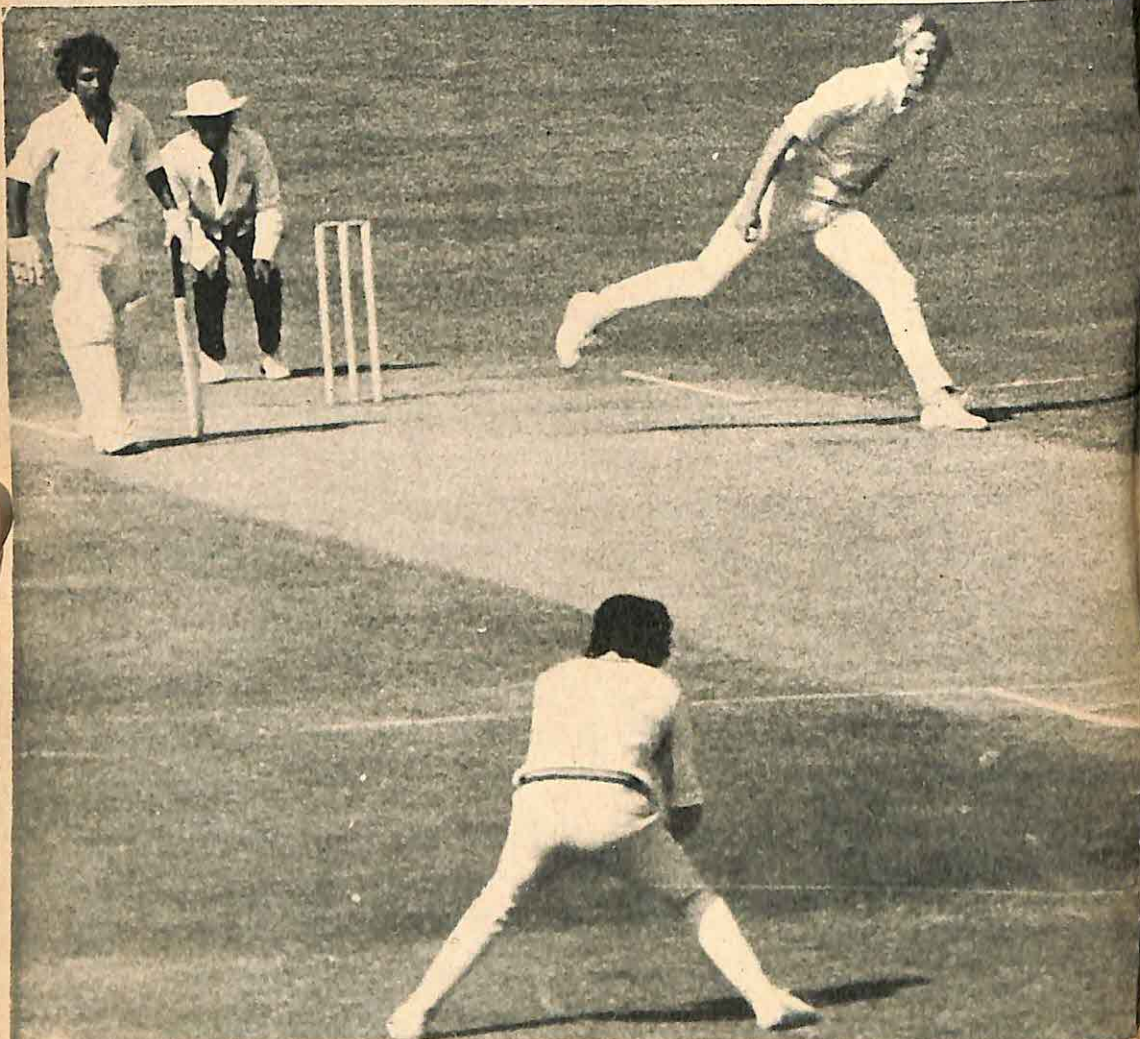
নিয়ম অনুযায়ী ক্রিকেটের পোশাক হচ্ছে, সাদা শার্ট, সাদা ট্রাউজার, পুরু সাদা উলের মোজা আর সাদা ক্রিকেট বুট—সাধারণ জুতো কিন্তু নয়। এই বুটের তলায় খোঁচা খোঁচা ভোঁতা পেরেক লাগানো থাকে, যাতে ঘাসের উইকেটের ওপর খেলোয়াড়ের পা হড়কে না যায়। ক্রিকেটের প্রচলিত প্রথা অনুসারে খেলোয়াড়দের সাধারণ ট্রাউজারই পরা উচিত, আজকালকার ফ্যাশন-দুরস্ত কায়দা-কানুন করা ট্রাউজার নয়।

ক্রেপ সোলের জুতো কিংবা বুট কখনই পরা উচিত নয়। অবশ্য বোলারের এই ধরনের জুতো বা বুট পরার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তাহলে বল দেবার সময় দৌড়ুতে গিয়ে পায়ে তিনি ভালো গ্রিপ পাবেন না।

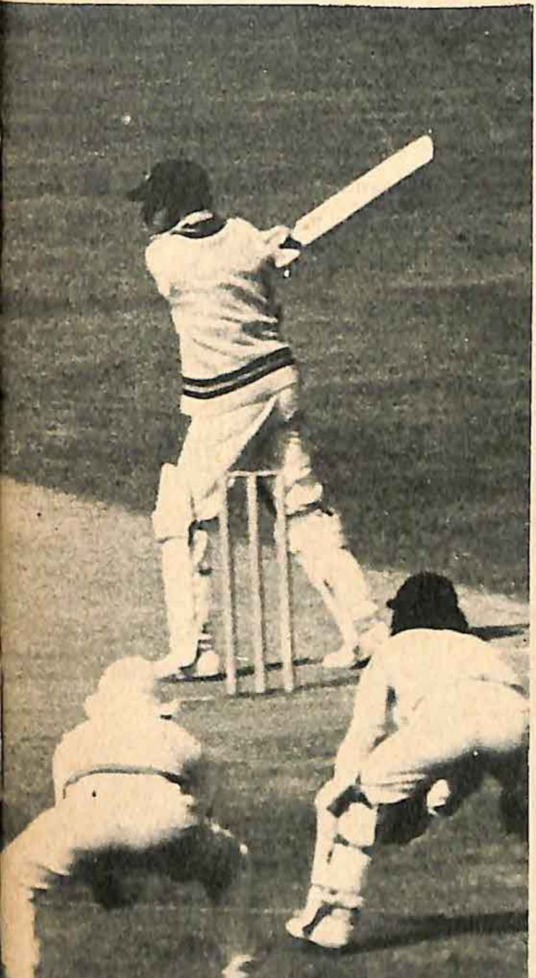
ক্রিকেট খেলোয়াড়দের লম্বা চুল রাখাও উচিত নয়। চুল ঢাকার জন্য আর মাথাটাকে রোদ্দুর থেকে বাঁচানোর জন্য একটা টুপি পরা দরকার। ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়ায় এই টুপি ঠাণ্ডার হাত থেকে মাথাটাকে রক্ষা করে।

মাঠের বাইরেও কখনও সান-গ্লাস পরতে নেই। রঙিন চশমা একটা ফ্যাশন হয়েছে ঠিক এবং তা সূর্যের চোখ-ধাঁধানো আলো থেকে চোখ দুটোকে বাঁচায় তা-ও সত্যি—কিন্তু সব সময় রঙিন চশমা পরার ফলে সূর্যের উজ্জ্বল আলো সহ্য করার যে শক্তি তা কমে যায়। ফলে মাঠে খেলতে নেমে খেলোয়াড়ের চোখে রোদ্দুরটা খুব কড়া মনে হতে পারে।

আমরা ক্রিকেট খেলোয়াড়দের কী পোশাক হবে তা বলেছি, কিন্তু আম্পায়ারদের কী পোশাক হবে তা বলি নি। আম্পায়াররা আগে যে কোনো পোশাক পরতে পারতেন। তবে সেই পোশাকের ওপর তাঁদের একটা লম্বা সাদা কোট পরে নিতে হ'ত। কিন্তু এখন ভারতে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের আম্পায়ারদের একটা সাদা কোট পরতেই হয়—এবং সেই কোটটা খুব বেশি খাটোও হয় না, খুব বেশি লম্বাও হয় না। আর পরতে হয় একটা সাদা কাপড়ের টুপি, কালো ট্রাউজার আর সাদা জুতো। এই পোশাকে তাঁদের আগের চেয়ে অনেক বেশি ভারিক্কি দেখায়।



টনি গ্রিগ বল করছেন



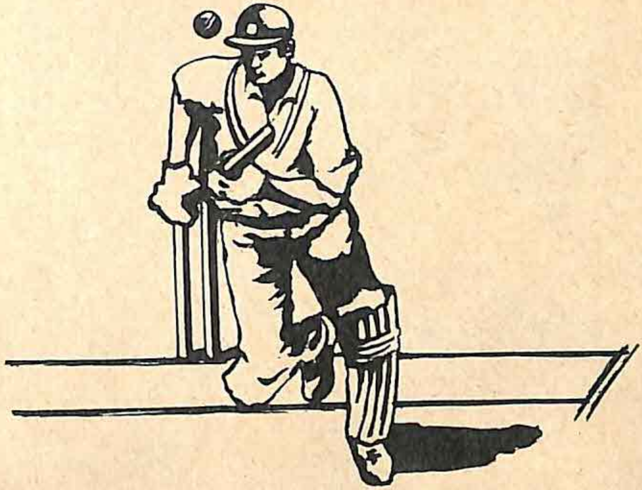
টস

প্রত্যেকটা ম্যাচ আরম্ভ হবার আগে স্থানীয় দলের অধিনায়ক আগন্তুক দলের অধিনায়কের কাছে গিয়ে তাঁকে এগিয়ে আসতে ও ইনিংস বাছাই করার জন্য টস করতে অনুরোধ করেন। খেলার মাঠেই টস করতে হয়। স্থানীয় দলের অধিনায়ক তাঁর নিজের মুদ্রা ব্যবহার করেন এবং 'হেড' বা 'টেল' বলার বিশেষ অধিকারটা থাকে আগন্তুক দলের অধিনায়কের।

স্থানীয় দলের অধিনায়ক তাঁর মুদ্রার দুটো পিঠই আগন্তুক দলের অধিনায়ককে দেখিয়ে নেন, যাতে এমন কোনো সন্দেহ দেখা না দেয় যে, মুদ্রার দুটো পিঠেই হেড আছে কি টেল আছে। আবার যাতে কোনো রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয় সেজন্য মুদ্রাটা মাটিতে পড়ার আগেই আগন্তুক দলের অধিনায়ক বেশ জোরে এবং স্পষ্ট করে 'হেড' কিংবা 'টেল' বলেন। টসে কে জিতেছেন সে বিষয়ে অপর পক্ষ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো অধিনায়কই মাটি থেকে মুদ্রাটা তোলেন না। যে পক্ষ টসে জেতেন, ইচ্ছে করলে সেই পক্ষ প্রথমে ব্যাট করতে পারেন, আবার অন্য পক্ষকেও প্রথমে ব্যাট করতে দিতে পারেন।

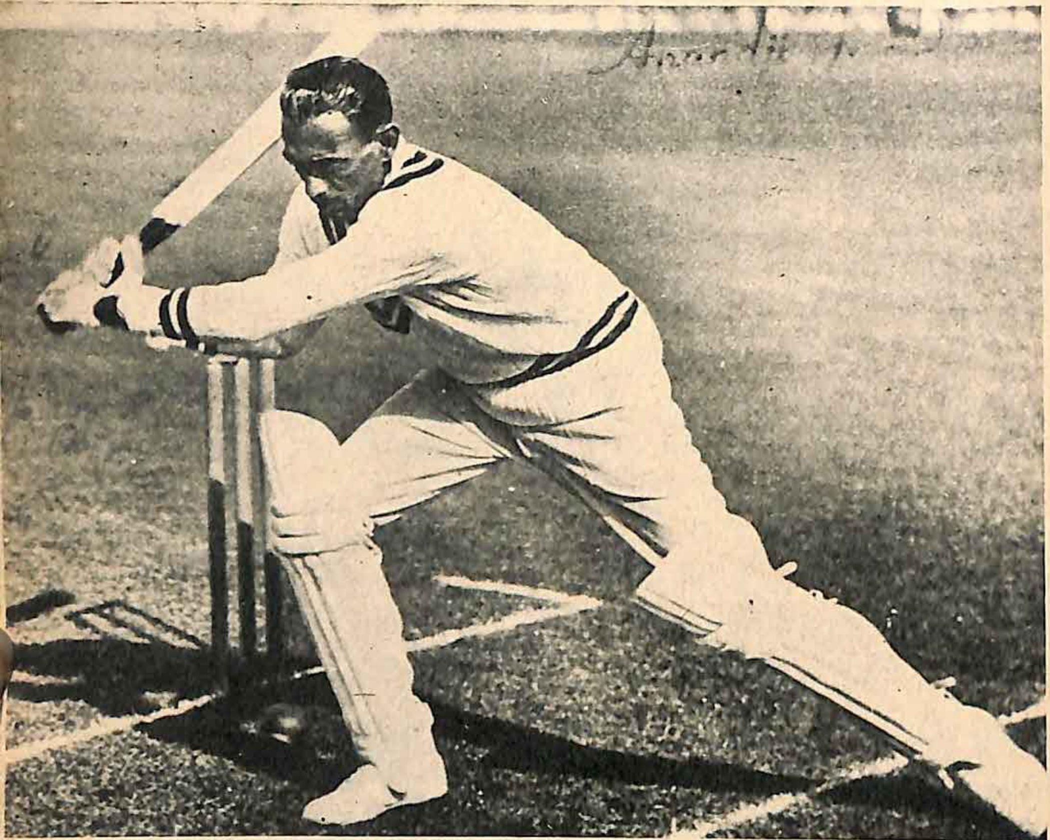
অধিনায়করা যখন টস করতে আসেন তখন তাঁরা তাঁদের খেলোয়াড়দের চূড়ান্ত তালিকা সঙ্গে করে নিয়ে আসেন এবং টসের আগে তা পাল্টাপাল্টি করে নেন। একবার টস হয়ে গেলে কোনো পক্ষের কোনো খেলোয়াড়কেই আর বদলানো যায় না। এটা করা হয়, যাতে কোনো অধিনায়ক টসের পরে তাঁর দল যে পরিস্থিতিতে পড়েছে সেই পরিস্থিতির বিশেষ সুযোগ নিতে না পারেন এবং তাঁর দলে একজন বাড়তি ব্যাটসম্যান কি বোলার আনতে না পারেন।

একটা উদাহরণ হিসেবে আমরা 1964-65 সালে ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে যে ঘটনা ঘটেছিল তার উল্লেখ করতে পারি। সেই সময় অস্ট্রেলিয়া দল এখানে খেলতে এসেছিলেন। তাঁরা টসে জিতেছিলেন এবং ব্যাট করতে নেমেছিলেন। যখন তাঁদের ওপ্‌নিং পেয়ার বা আরম্ভের জুড়ি ব্যাট করতে আরম্ভ করেছিলেন তখন তাঁদের ব্যাটিং তালিকায় তিন নম্বরে যাঁর নাম ছিল, সেই নরম্যান ও'নীলের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। তিনি খেলতে পারলেন না। তবু, ক্রিকেটের আইন অনুসারে, তাঁর জায়গায় তাঁর দলে অন্য কাউকে নিতে দেওয়া হ'ল না—যদিও ও'নীল তখনও একবারও ব্যাট করেন নি, এমন কি ক্রিকেট মাঠে নামেন নি পর্যন্ত। অস্ট্রেলিয়া দল সারাক্ষণ দশজন খেলোয়াড় নিয়েই খেলে গেলেন, যদিও তাঁদের ঐ অসুস্থ খেলোয়াড়ের জায়গায় ফিল্ড করার জন্য অন্য একজন ফিল্ডারকে নেবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।



ব্যাটিং

ব্যাটিং হচ্ছে এক ধরনের আর্ট। দুভাবে এটা শেখা যায়। প্রথম, একেবারে স্কুল-জীবন থেকে উপযুক্ত কোচের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে; আর দ্বিতীয়, অনুশীলন করে, গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং অন্যদের খেলায় ভালো জিনিসগুলো অনুসরণ করে। আমাকে কেউ কখনও শিক্ষা দেয় নি। যেসব ব্যাটসম্যানের খেলা আমার ভালো লেগেছে, আমি তাঁদের খেলা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করেছি, তারপর তাঁদের ভালো জিনিসগুলো আমার নিজের স্টাইল আর মানসিকতার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছি। সেই কারণে আমার ব্যাটিং গড়ে উঠেছে অন্তত সাত-আটজন বিভিন্ন ব্যাটসম্যানের ভালো ভালো জিনিসগুলোকে ভিত্তি করে। কিন্তু তাঁদের কাউকেই আমি নকল করার চেষ্টা করিনি। কারণ, নকল করলে নিজের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায়। একটা উদাহরণ দিই: আমি মুশ্‌তাক আলির দ্রুত পদক্ষেপ, এল পি জয়ের সজোরে হুক করার কায়দা,



সি. কে. নাইডু

লালা অমরনাথের ক্রীজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে আস্তে আসা বলকে ফুল পিচ করে অথবা হাফ-ভলি করে খেলার কৌশল, বিজয় হাজারের অত্যন্ত গভীর মনোযোগ, দলীপ সিংজীর লেট-কাট, ওয়াজির আলির নিশ্ছিদ্র রক্ষণ ইত্যাদি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। ব্যাটিংয়ের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যতখানি সম্ভব সোজা ব্যাট দিয়ে বলটাকে আঘাত করা। তার জন্য গভীর মনঃসংযোগ এবং কীভাবে

বলটা খেলবে সে সম্বন্ধে তোমার সঠিক সিদ্ধান্ত, সঠিক ফুট-ওয়ার্ক আর নির্ভুল প্রয়োগকৌশলই সবচেয়ে বেশি দরকার। যতক্ষণ পর্যন্ত-না বলটা করা হচ্ছে, ব্যাট করতে নেমে কখনও আগে থেকে স্থির কোরো না, কোন্ বল তুমি মারবে এবং মারলে কোথায় মারবে। একটা নীতি ঠিক করে নাও—যে নীতি কখনও তুমি ব্যাট করার সময় ভুলবে না—প্রত্যেকটা বলই তার গুণ অনুসারে খেলতে হবে ; এবং বলটা যেমন চাইবে তেমন হবে তোমার স্ট্রোক, প্রতিরক্ষামূলক না আক্রমণাত্মক। নির্ভুল প্রয়োগকৌশলই হচ্ছে ভালো ব্যাটিংয়ের ভিত্তি এবং যদি কেউ সুপ্রতিষ্ঠিত ধারায় ব্যাট করে যান তাহলে আপনা থেকেই উইকেটের সমস্ত দিকে ভালো স্ট্রোক হবে।

একজন ব্যাটসম্যানকে কেবল প্রয়োগকৌশলের দিক থেকেই নির্ভুল হতে হবে না, বড়ো ম্যাচ খেলার মতো মেজাজও তাঁকে গড়ে তুলতে হবে। খেলতে খেলতে তাঁর দল যদি কোনো সময় প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে যায়, তখন তাঁকে নিরুৎসাহ হলে চলবে না। তাঁর স্নায়ু হবে ইস্পাতের মতো কঠিন। তাঁকে হতে হবে স্থির, অচঞ্চল। ব্যাটিংয়ে খুব অল্পেতেই ভুল হতে পারে। এত অল্পেতে যে, ছোট্ট একটা ভুলের দরুণ তোমার ইনিংস শেষ হয়ে যেতে পারে।

ক্রিকেটকে যে 'গেম অভ চান্স' বা 'অনিশ্চয়তার খেলা' বলা হয় সেটা ভুল। ক্রিকেট মোটেই সে রকম খেলা নয়। এই খেলা পরম নিপুণতার, কঠোর ও অবিরাম অভ্যাসের, পূর্ণ মনঃসংযোগের এবং বড়ো ম্যাচ খেলার মেজাজের খেলা।

যখন তুমি নেটে খেলছ তখনও তোমার এমনভাবে ব্যাট করা উচিত যেন তুমি কোনো ম্যাচে ব্যাট করছ। এমন একটা ফিল্ড তুমি কল্পনা করে নাও, যেখানে একজন বিশেষ বোলার তোমাকে আউট করার জন্য তৈরী হয়ে আছে। এমনভাবে ব্যাট করো, যাতে খুব কম ভুল হয় এবং অকারণে তোমাকে উইকেট ছাড়তে না হয়। কখনও ভেব না, "তাতে কী হয়েছে! এটা তো শুধু প্র্যাকটিস!" প্র্যাকটিসের সময় যে খারাপ অভ্যেসগুলো তৈরি হয়ে যাবে তা থেকেই যাবে—এবং পরে যখন তুমি ম্যাচ খেলতে নামবে তখন সেই



অভ্যেসগুলো ছাড়তে পারবে না। আমাদের অনেক ক্রিকেট খেলোয়াড়ই, এমন কি সর্বভারতীয় স্তরের খেলোয়াড়রাও প্র্যাকটিসের ব্যাপারটাকে গভীরভাবে নেন না। ফলে ভালো ভালো খেলোয়াড়রাও অনেক সময় প্রথম পনের মিনিটের মধ্যেই তিন-চার বার আউট হয়ে যান।

একজন ব্যাটসম্যানকে শুধু এটাই স্থির করতে হয় না যে, কোন্ বল তিনি মারবেন। কোন্ বল তিনি খেলবেন আর কোন্ বল ছেড়ে দেবেন তা-ও তাঁকে ঠিক করতে হয়। বিশেষ করে একজন ওপনিং ব্যাটসম্যানকে ঠিক অফ-স্টাম্পের বাইরে সুয়িং করা বল সম্বন্ধে খুবই সতর্ক থাকতে হয়। কারণ, এই ধরনের বল ব্যাটের বাইরের ধারটাতে লেগে স্লিপে চলে যেতে পারে এবং তাতে ক্যাচ উঠে যেতে পারে। জ্যাক হব্‌স্ এ ব্যাপারে সবচেয়ে দক্ষ ছিলেন, কারণ বলটা নতুন হলে আর তার গতিবেগ বেশি থাকলে তিনি কখনই সেই বল খেলতেন না যদি তা এড়াতে পারতেন এবং তার উইকেটে এসে আঘাত করার সম্ভাবনা না থাকত তবে তিনি কখনই সেই বল খেলতেন না।

লালা অমরনাথ

বিজয় হাজারে →

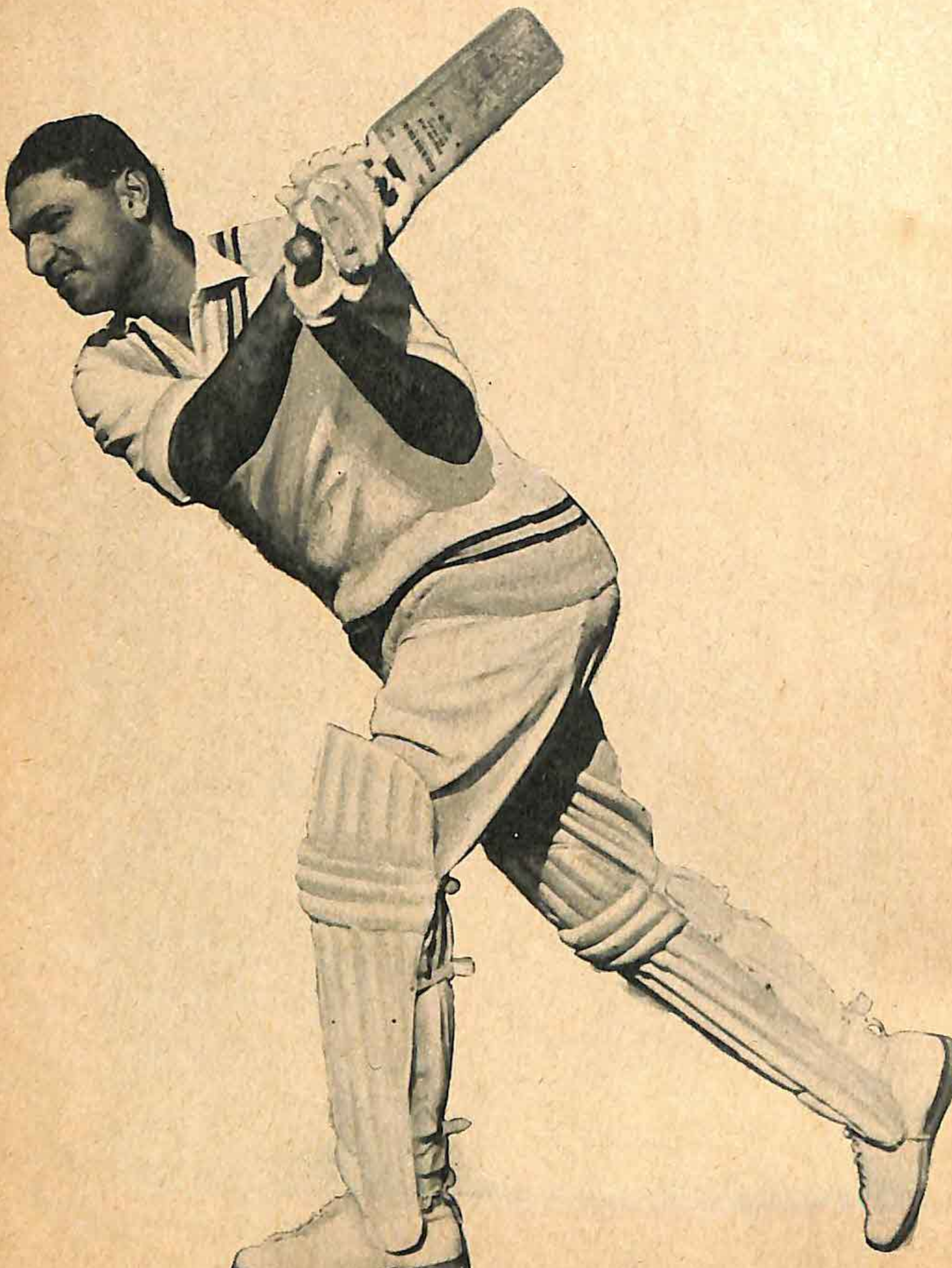


কতকগুলো স্ট্রোক আছে, যেগুলো একজন ব্যাটসম্যানের উচিত তাঁর ইনিংসের একটা বিশেষ পর্যায়ে এড়িয়ে যাওয়া। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, অন্তত ত্রিশটি রান না করা পর্যন্ত এবং বলের পালিশ বেশ কিছুটা উঠে না যাওয়া পর্যন্ত কোনো ওপনিং ব্যাটসম্যানের কখনই বল লেট-কাট করা উচিত নয়। যে বল তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে সেই বলকে স্কোয়ার-কাট করার চেষ্টাও তাঁর করা উচিত নয়। যদি তিনি সেই বলের ক্ষেত্রে হিসেবে এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগ সময়েরও ভুল করেন তাহলে সেই বল ব্যাটের মাঝখানে এসে আঘাত করবে না, ব্যাটের ভেতরের দিককার ধারে লেগে স্টাম্পে গিয়ে আঘাত করবে। আবার, একজন ওপনিং ব্যাটসম্যানের কখনই বল হুক করা উচিত নয়, যদি-না তিনি বলটা মাটি বরাবর রাখতে পারেন। এটা সহজ নয়, কারণ বল যখন ব্যাটে এসে আঘাত করে তখনও তা ওপর দিকে উঠতে থাকে—এবং কেবল উঁচু দরের ব্যাটসমানেরাই ব্যাটটাকে সময়মতো বলের ওপর নামিয়ে দিতে পারেন, যাতে বলটা মাটি বরাবর থাকে।

যে পথে বল শূন্যে ধেয়ে আসে তার আড়াআড়ি কখনও বল মারতে নেই। স্পিনের বিরুদ্ধেও না। কারণ, তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কখনও কখনও ব্যাটসম্যান হয়তো পার পেয়ে যেতে পারেন, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই তাঁকে এর জন্য খেসারত দিতে হয়—হয় বলটা সম্পূর্ণ মিস করেন, নয়তো তার কিনারায় ঘা মেরে বিপক্ষ দলের ক্যাচের সুবিধে করে দেন। ব্যাটে বল খেলার সবচেয়ে নিরাপদ উপায় কেবল সোজা ব্যাট দিয়ে বলের মোকাবিলা করা নয়, ব্যাটের ব্যাক-লিফ্ট্, অর্থাৎ পেছন দিকেও যাতে যতটা সম্ভব ব্যাট ওঠে তা দেখা। বহু ব্যাটসম্যান থার্ড-ম্যানের দিকে ব্যাটটাকে ব্যাক-লিফ্ট্ দেন এবং তারপর বলের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের মুহূর্তে ব্যাটটাকে সোজা নিচে নামিয়ে আনেন। এই ধরণের স্ট্রোক প্র্যাকটিসে চলতে পারে, কিন্তু ম্যাচে কখনও কখনও তা বিপজ্জনক হয়ে দেখা দেয়। ব্যাক-লিফ্ট্ সম্পূর্ণ সোজা হলে ভুল হবার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। যদি বারবার এটা প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমার সম্পূর্ণ সোজা ব্যাটে খেলার অভ্যেস হয়ে যাবে। পৃথিবীর সেরা সেরা ক্রিকেট খেলোয়াড়রা



মানকড় বল করছেন



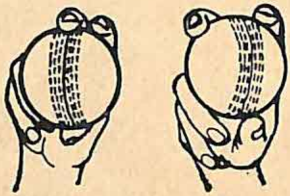
অভ্যেস করেই এই স্টাইলটা আয়ত্ত করেছেন। সেই কারণে তাঁদের ভুলও অনেক কম হয়।

একজন ব্যাটসম্যানকে তাঁর ইনিংস গড়ে তুলতে হবে। কোনো ব্যাটস-ম্যানের পক্ষে আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা কি তার চেয়েও বেশি সময় উইকেটের কাছে থাকাটা যথেষ্ট নয়, যদি-না তিনি তাঁর দলের পক্ষে একটা বড়ো ইনিংস খেলতে পারেন। বড়ো স্কোর মানে ব্যাটসম্যানের নিজের খেলা নয়, তাঁর দল যাতে জিততে পারে তার জন্য তাঁকে রান তুলতে হবে। এগারজন খেলোয়াড়ের একটা দলে প্রত্যেকেই প্রত্যেক ম্যাচে কৃতিত্ব দেখাতে পারেন না। যাঁরা ভালো খেলেন তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে, কোনো একটা বিশেষ ইনিংসে যাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন তাঁদের ক্ষতিটাকে পুষিয়ে দেওয়া এবং ম্যাচটা জেতার জন্য একটা বড়োসড়ো রানসংখ্যা গড়ে তোলা।

আজকের দিনে আমাদের ক্রিকেটে এই ভাবটার অভাব দেখা যায়। ভারতের বেশ কিছু ব্যাটসম্যান পঞ্চাশ-ষাটের ওপর স্কোর করে আত্মপ্রসাদে ভরে ওঠেন। তার ফলে তাঁদের মনঃসংযোগ নষ্ট হয়ে যায়, এবং তাঁরা বুঝতে পারার আগেই আউট হয়ে যান। আগে বিজয় হাজারে, বিনু মানকড়, বিজয় মঞ্জরেকর, পলি উমরিগড় আর রুশি মোদীর মতো ব্যাটসম্যানেরা আলাদা আলাদা ভাবে বড়ো বড়ো স্কোর করতেন, কারণ তাঁরা তাঁদের দলকে জেতাতে চাইতেন।

জন্মেই কেউ আর ব্যাটসম্যান হয় না, ব্যাটসম্যান হিসেবে নিজেকে তৈরি করে নিতে হয়। একজন মাঝারি গোছের ব্যাটসম্যানেরও যদি কঠোর অনুশীলন, গভীর মনঃসংযোগ, আপন উদ্দেশ্যের প্রতি অনন্যচিত্ততা আর বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা থাকে তাহলে তাঁর পক্ষে একজন অত্যন্ত ভালো ব্যাটসম্যান না হবার কোনো কারণ নেই। ব্র্যাডম্যান, ট্রাম্পার, হ্যামণ্ড, সোবার্স এবং আরও কয়েকজন হয়তো জন্ম-ব্যাটসম্যান, কিন্তু আমি এমন অনেক খেলোয়াড়ের নাম করতে পারি, যাঁরা কেবল অধ্যবসায় আর কঠোর পরিশ্রমের ফলেই খুব উঁচু দরের ব্যাটসম্যান হতে পেরেছেন।

← পলি উমরিগড়

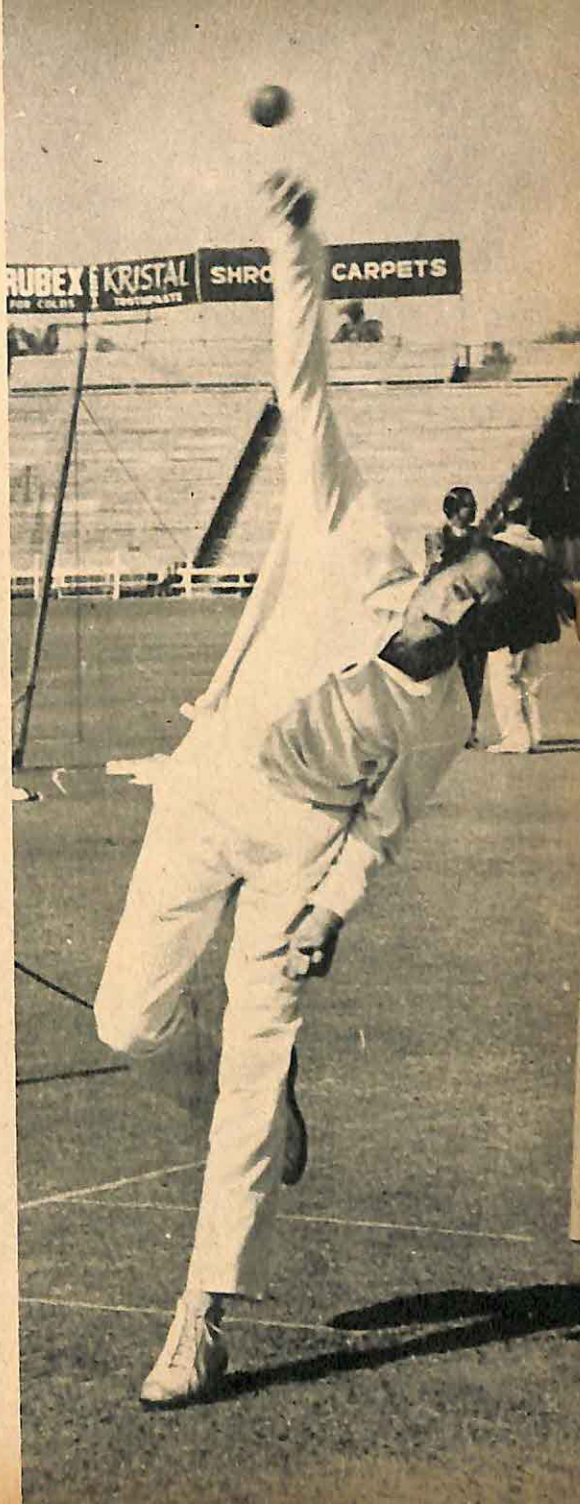


বোলিং

ভালো বোলিংয়ের দুটো জরুরি জিনিস হ'ল, লেংথ বা বলের পূর্ণ দৈর্ঘ্য আর ডিরেকশন বা নিশানা। সুইং আর সোয়ার্ভ আসে পরে। বিভিন্ন রকমের স্পিন আরও পরে। ঠিক সেই রকমভাবে পেস বা বলের বেগ। একজন বোলার যত ভালোভাবেই বলটাকে স্পিন করুন না কেন এবং যত দ্রুতই তিনি বল করুন না কেন, তাঁর বলের যদি-না লেংথ আর ডিরেকশন্ থাকে তাহলে সেই বলে তিনি উইকেট পাবেন না, বলটাকে সারা মাঠে পিটিয়ে খেলা হবে। নিয়মিত অভ্যাস ছাড়া লেংথ আর ডিরেকশন আসে না। বড়ো বড়ো বোলাররা ঘণ্টার পর ঘণ্টা নেটে কাটিয়েছেন লেংথে বল করে আর একটা মাত্র উইকেটে বল করে। একবার লেংথ আর ডিরেকশন ঠিক হয়ে গেলে পর বোলিংয়ের একটা শক্ত ভিত তৈরি হয়ে যায়। বিখ্যাত বোলার ক্ল্যারি গ্রিমেট এই দুটি

জিনিসে দক্ষতা অর্জনের জন্য তাঁর বাড়ির পেছনের মাঠে একটা পিচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা মাত্র উইকেটে হাজার হাজার বল করে প্র্যাকটিস করতেন। বল করার পর বলগুলো কুড়িয়ে আনার জন্য একজন বল-বয় রাখার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। তাই তিনি একটা নতুন বুদ্ধি বার করেছিলেন। তিনি তাঁর কুকুরকে এমন শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, তিনি আটটা বলের এক-একটা ওভার করার পর কুকুরটা বলগুলো কুড়িয়ে আনত। কুকুরটা এক কোণে চুপটি করে শুয়ে থাকত, একটা ওভার শেষ হয়ে গেলে গ্রিমেট শিস্ দিতেন আর কুকুরটা অমনি উইকেটের কাছে ছুটে গিয়ে একটা একটা করে বলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আসত। গোটা ব্যাপারটায় দু মিনিটের বেশি সময় লাগত না। ক্ল্যারি গ্রিমেটের মতো পৃথিবীর একজন অত্যন্ত নির্ভুল বোলারের যদি এই রকম কঠিন প্র্যাকটিসের দরকার হয় তাহলে একজন তরুণ ক্রিকেটারের তার হাজার গুণ বেশি দরকার হবে।

একজন বোলারকে সব সময়



চন্দ্রশেখর বল করছেন

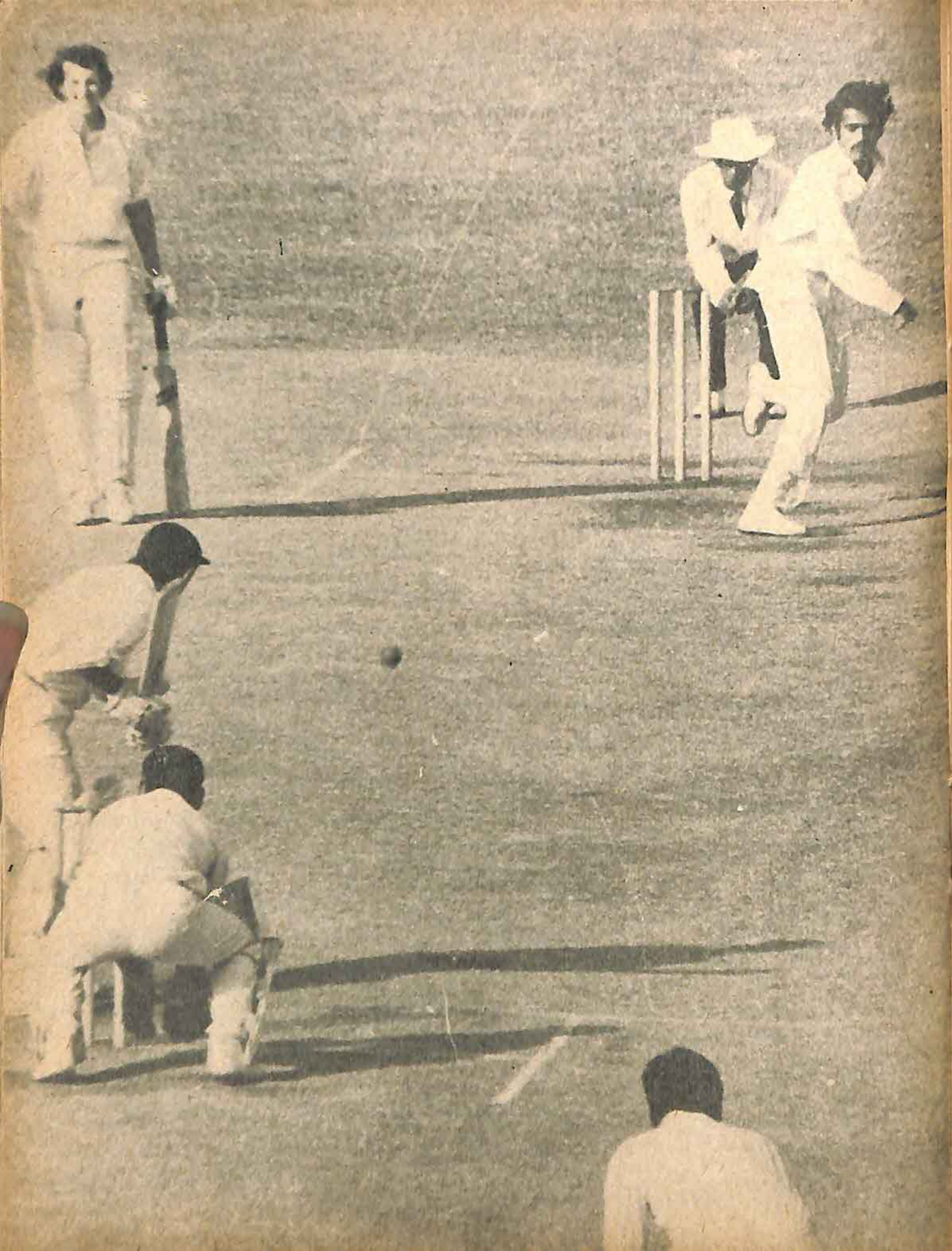


ক্ল্যারি গ্রিমেট

তাঁর সাধ্যমতো যত ভালো সম্ভব বল করতে হবে, এমন কি নেটেও। তাঁকে সঠিকভাবে জানতে হবে, তিনি কীভাবে বল করতে যাচ্ছেন এবং একজন বিশেষ ব্যাটসম্যানের ক্ষেত্রে কী ধরনের ফিল্ড-প্লেসিং তাঁর দরকার হবে। এইভাবে তিনি বুঝতে পারবেন, কীকরে খুব কম রান দিতে হয় ও বেশি উইকেট নিতে হয়। একজন ফাস্ট বোলারের শরীরে প্রচুর শক্তি আর পরিশ্রম করার ক্ষমতা থাকা দরকার, যেখানে একজন স্লো বোলার প্রধানত তাঁর অতি নির্ভুল হিসেবের ওপরই বেশি নির্ভর করেন। একটা ভালো উইকেটে একজন বোলারকে 40 থেকে 70 ওভার পর্যন্ত বল করতে হতে পারে। 1967 সালে বার্মিংহামে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের যে টেস্ট খেলা হয়েছিল, রামাধীন তাতে একটা ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে 98 ওভার পর্যন্ত বল করেছিলেন।

কোনো ফিল্ডারের হাত থেকে যদি কখনও কোনো ক্যাচ ফস্কে যায় তাহলে বোলারের উচিত তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়া। চিৎকার করে উঠলে বা তাঁকে গালাগাল দিলে অথবা ভেংচি কাটলে কোনো লাভ হয় না, বরং তাতে ফিল্ডারের মন ভেঙে যায়। তিনি হয়তো আর একটা ক্যাচ মিস করে বসেন। কিন্তু বোলার যদি একটুখানি সহানুভূতি দেখান, একটুখানি উৎসাহ দেন তাহলে ফিল্ডারের তাতে অনেক ভালো হয়, পরের বার ভালো করতে তিনি অনুপ্রেরণা পান।

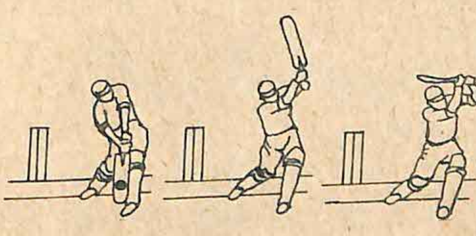
কথায় বলে, বোলাররাই ম্যাচ জেতেন। নিশ্চয়ই জেতেন এবং একজন বোলার তাঁর প্রতিকূল উইকেট থেকে একজন ব্যাটসম্যানকে আউট করে দিয়ে তাঁর সত্যিকারের নিপুণতার পরিচয় দেন। বোলারদের দুর্ভাগ্য যে, যেসব ব্যাটসম্যান বড়োসড়ো রান করেন বা রেকর্ড স্থাপন করেন, তাঁদের মতো প্রচার তাঁরা পান না। এখনও দীর্ঘদিনের ব্যাটিং রেকর্ড যদিও একের পর এক ভাঙা হচ্ছে তবু একটা মাত্র টেস্ট ম্যাচে 19টি উইকেট নেবার যে রেকর্ড জিম লেকার স্থাপন করে গেছেন তা হয়তো কখনও কোনো টেস্ট ক্রিকেটে বা প্রথম শ্রেণীর কোন ক্রিকেটে কেউ ভাঙতে পারবেন না। বোলাররা যদিও সমান



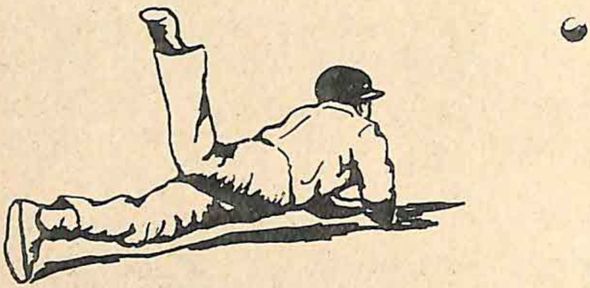
নাম পান না, তবু তাঁদের মনে রাখতে হবে যে, দলে তাঁরাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। যদি তাঁরা একটা ম্যাচে অপর পক্ষকে দুবার আউট করতে না পারেন তাহলে সেই ম্যাচ কখনও জেতা যাবে না, ব্যাটসম্যানদের বেশি রান তোলা সত্ত্বেও না।

আজকের দিনে বড়ো বড়ো ম্যাচ খেলার জন্য যেসব উইকেট তৈরি করা হয় তার বেশির ভাগ উইকেটেই বোলারকে অনেক দুঃসাধ্য সাধন করতে হয়। কিন্তু অভিযোগ করে লাভ নেই। যে কোনো বোলারই তাঁর সুবিধামতো উইকেটে ভালো বল করতে পারেন, কিন্তু খুব কম বোলারই প্রতিকূল উইকেটে প্রাণ পেয়ে থাকেন এবং বলটাকে দিয়ে 'কথা বলাতে পারেন'। এই জাতীয় বোলাররাই খুব উঁচুতে উঠতে পারেন এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করতে পারেন।

বোলাররা কেবল তাঁদের আঙুল কি হাত দিয়ে অথবা দেহ দিয়েই বল করেন না, মাথা দিয়েও করেন। অর্থাৎ একজন বোলারকে ব্যাটসম্যানের দুর্বল দিকগুলো ভেবে নিতে হবে এবং যেসব স্ট্রোকে তিনি অসুবিধায় পড়তে পারেন সেগুলো স্থির করে নিতে হবে। ভালো বোলাররা জানেন যে, একজন ভালো ব্যাটসম্যানের একটা জোরাল দিক তাঁকে মুহূর্তের মধ্যে খারিজ করার পথ প্রশস্ত করে দিতে পারে। যেমন—একজন ব্যাটসম্যানকে খাটো লেংথের বল হুক করতে দিলে বলটাকে তাঁর ডীপ-ফাইন লেগে ক্যাচ উঠতে দেবার সম্ভাবনাই বেশি, যদি কিনা বোলার বুদ্ধি করে এমন নিশানায় বল করেন যেখানে ব্যাটসম্যান বলটাকে স্কোয়ারে হিট করতে পারেন না, মাটি ঘেঁষেও না। যেসব ব্যাটসম্যান স্কোয়ার-কাট করেন কি লেট-কাট করেন কিংবা সুইপ করেন তাঁদের বেলায়ও এই একই কথা। এইসব স্ট্রোকে অনেক রান ওঠে ঠিক, কিন্তু বোলার যদি ব্যাটসম্যানকে একবার বুদ্ধি করে ফাঁদে ফেলতে পারেন তাহলে ব্যাটসম্যান সঙ্গে সঙ্গে খারিজ হয়ে যেতে পারেন। তখন সেটা ব্যাটসম্যান আর বোলারের মধ্যে বুদ্ধির লড়াই হয়ে দাঁড়ায়। আর ব্যাটসম্যানকে আউট করতে বোলারের বুদ্ধিটাই কাজে লাগে বেশি।

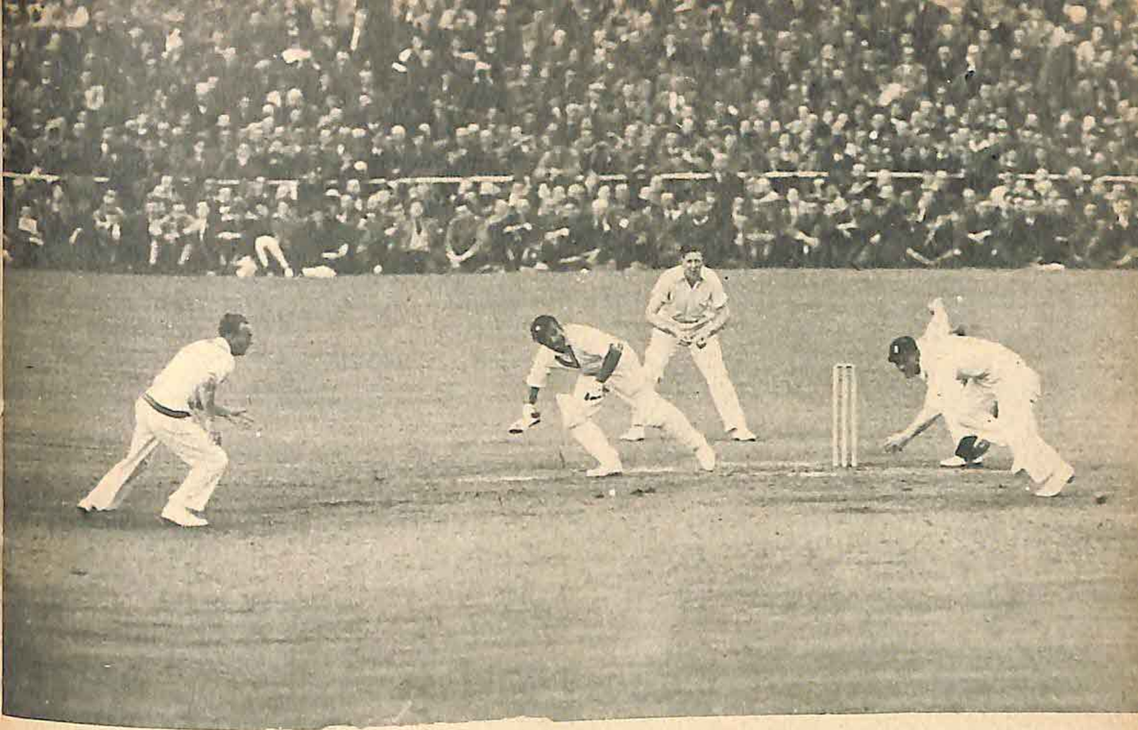


← 1972-73 সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলায় চন্দ্রশেখর বল করছেন



ফিল্ডিং

ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে উপেক্ষিত আর অবহেলিত দিক ছিল ফিল্ডিং। এতদিন কোনো ব্যাটসম্যান যদি পঞ্চাশটার বেশি রান করতে পারতেন কিংবা কোনো বোলার যদি পাঁচটার বেশি উইকেট নিতে পারতেন তাহলেই তাঁকে দলে নেওয়া হ'ত—তা তিনি ক্যাচ ধরতে পারুন আর না-ই পারুন। ভারতীয় ক্রিকেটের এটাই ছিল সর্বনাশা ব্যাপার। কিন্তু গত দু বছর ধরে, যখন থেকে প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ খেলোয়াড়দের দলে নেওয়া শুরু হয়েছে তখন থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে এবং ভারতের ফিল্ডিং এখন বিশ্ব-মানে পৌঁছে গেছে। আমাদের বোলার আর ব্যাটসম্যানদের সম্বন্ধে আমরা যেমন গর্বিত, ঠিক তেমনি আজ আমরা আমাদের ফিল্ডারদের নিয়েও গর্ব করতে পারি। দলে খারাপ ফিল্ডারদের নেওয়ার যে দুর্ভাগ্যজনক প্রবণতা সেটা শুরু হয় সেই স্কুল-পর্যায়ে, তারপর তা কলেজ এবং রাজ্য পর্যায়েও চলে—এবং শেষে আমাদের টেস্ট দলেও তা দেখা যায়। অবস্থার



1946 সালে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে মার্চেন্ট খেলছেন

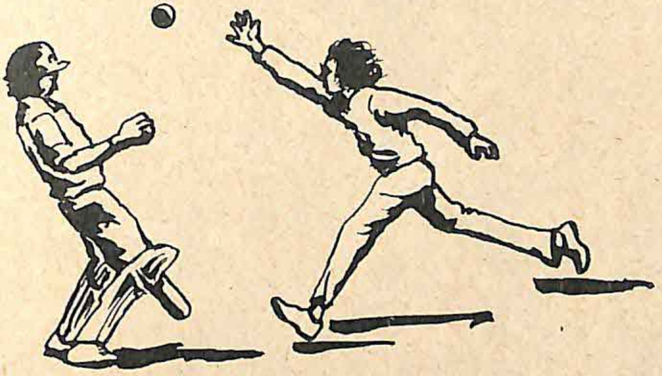
উন্নতির একমাত্র উপায় হচ্ছে, সমস্ত শ্রেণীর ক্রিকেট থেকেই খারাপ ফিল্ডারদের বাদ দেওয়া। যদি তা দেওয়া হয় তাহলে সাত থেকে দশ বছরের মধ্যেই আমাদের কোনো রাজ্য-একাদশ দলে একজন মাত্রও খারাপ ফিল্ডার দেখা যাবে না—ফলে আমাদের টেস্ট দলেও না।

একজন ব্যাটসম্যান রান না-ও তুলতে পারেন, একজন বোলার উইকেট না-ও পেতে পারেন—কিন্তু একজন ভালো ফিল্ডার কখনই ক্যাচ ধরতে অসফল হবেন না। একজোড়া নিভুর্ল হাত, ক্ষিপ্রতা, আগে থেকে বোঝার ক্ষমতা, পরিচ্ছন্নভাবে বল তোলা ও ভালোভাবে বল ছোড়া—এসবই কঠোর অভ্যাসের ফলে আয়ত্ত করা যায়। ভালো ব্যাটিং আর ভালো বোলিং দেখে যেমন আনন্দ হয়, তেমনি ভালো ফিল্ডিং দেখতে পেলেও মন খুশিতে ভরে ওঠে। 1946 সালে ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় দলের ব্যাটিং আর বোলিং দেখার



1946 সালে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ভারতীয় খেলোয়াড়রা মাঠে নামছেন

জন্যই শুধু লোকে মাঠে ভিড় করত না, গুল মোহাম্মদের অতুলনীয় ফিল্ডিং দেখার জন্যও তারা ভিড় করত। এখন একনাথ সোলকারের শর্ট স্কোয়ার-লেগ আর শর্ট ফাইন লেগে চমৎকার চমৎকার ক্যাচ দেখতেও ঠিক তেমনি আনন্দ লাগে। একটা ভালো ক্যাচ কিংবা রান-আউট কী করে যে একটা খেলার গোটা চেহারাটাই পালটে দিতে পারে এবং দলকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে তা অনেকে পুরোপুরি বোঝেন না। একটা ক্যাচ মিস করার জন্য একটা দলকে যে দাম দিতে হয় তা কখনও রানের সংখ্যা দিয়ে হিসাব করা যায় না। আমরা সত্যি সত্যিই বলতে পারি, "ক্যাচই ম্যাচ জেতায়।"



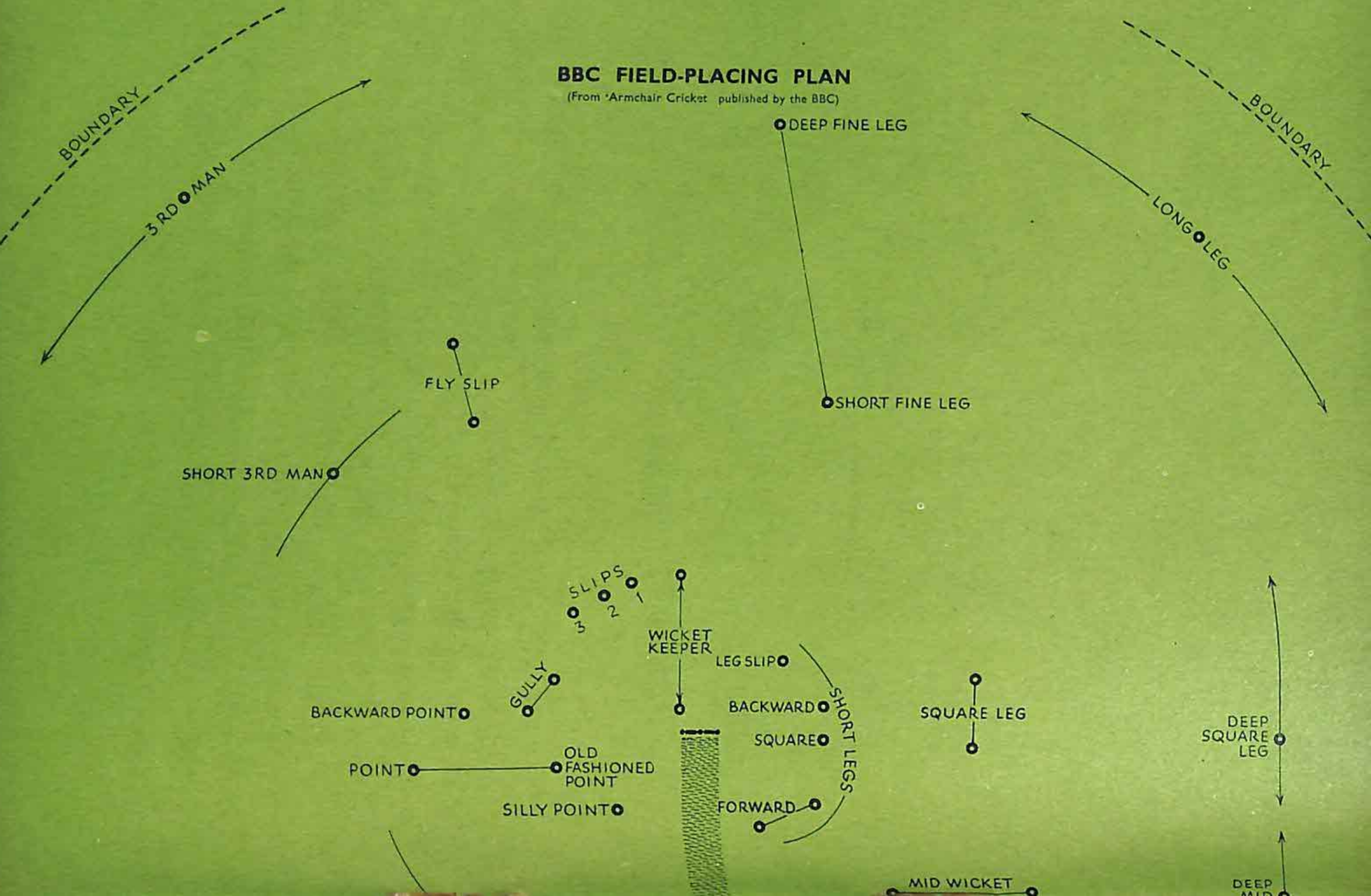
ডিসিপ্লিন ও টীমওয়ার্ক

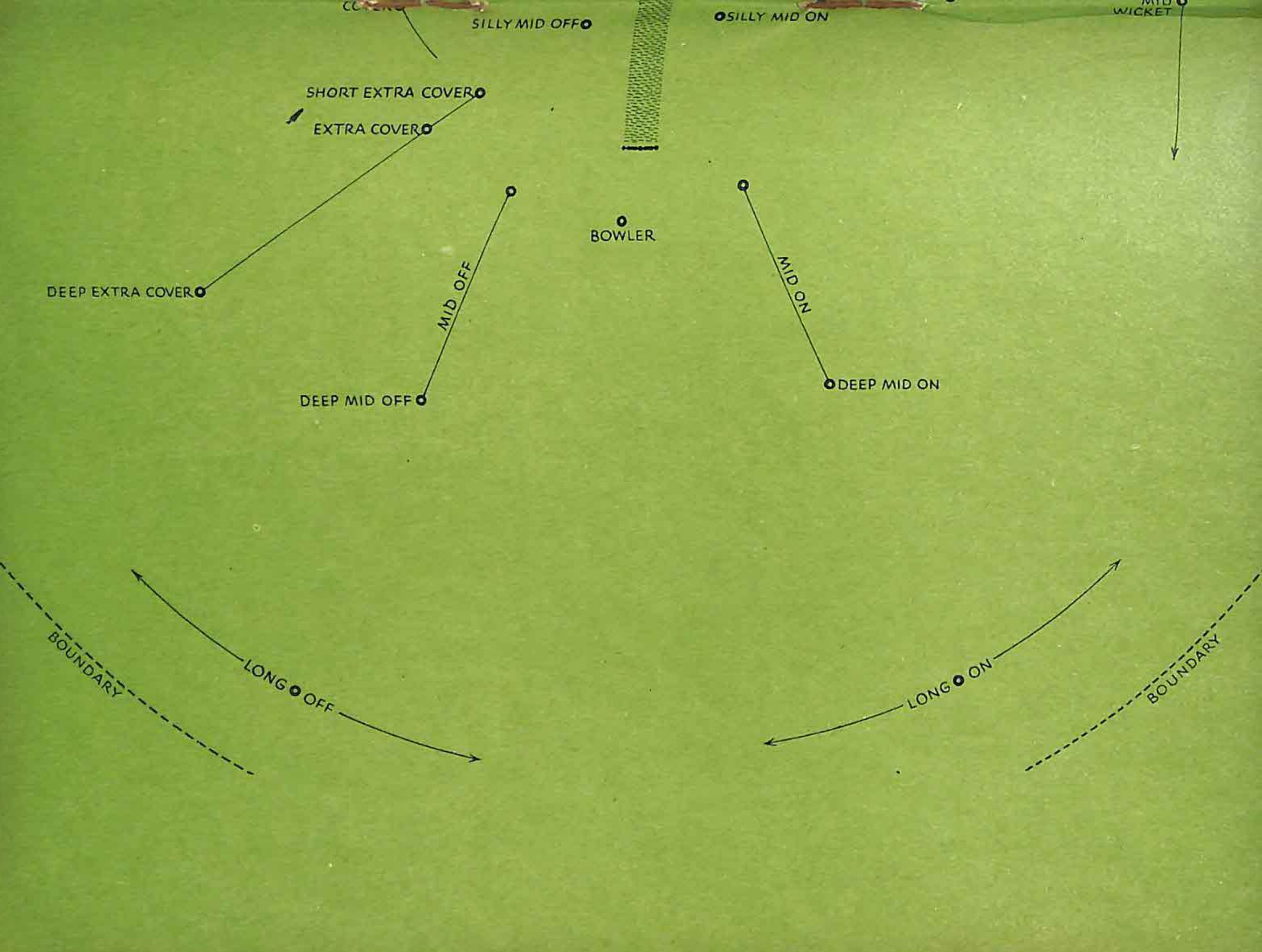
কথা দুটো প্রায়শই খুব আলগাভাবে ব্যবহার করা হয়। অনেকে স্পষ্ট করে জানেনও না, কথা দুটোর কী মানে। ডিসিপ্লিন বা শৃঙ্খলা মানে হচ্ছে, কথায় ও কাজে ক্যাপ্টেন বা অধিনায়কের কথা মানা। অধিনায়ক যদি চান, তুমি দ্রুত রান তুলবে তাহলে কখনই তুমি তাঁর সঙ্গে উইকেটের অবস্থা, বোলিং ভালো হচ্ছে কি খারাপ হচ্ছে, পিচের অবস্থা কীরকম—এসব নিয়ে তর্ক কোরো না। তাঁর আদেশ পালন করার জন্য তোমার সাধ্যমতো তুমি চেষ্টা করে যাবে।

মাঠের বাইরেও একজন খেলোয়াড়কে নিজের প্রতি যত্ন নিতে হবে এবং নিজেকে ষোল আনা 'ফিট', অর্থাৎ কর্মক্ষম রাখতে হবে। দলের জন্য তাঁকে স্বার্থ ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। দলের সাফল্যই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে। ডিসিপ্লিন বলতে আমি এ-ই বুঝি '

BBC FIELD-PLACING PLAN

(From 'Armchair Cricket' published by the BBC)





SILLY MID OFF
SILLY MID ON
WICKET
SHORT EXTRA COVER
EXTRA COVER
BOWLER
DEEP EXTRA COVER
MID OFF
MID ON
DEEP MID OFF
DEEP MID ON
BOUNDARY
LONG OFF
LONG ON
BOUNDARY

কোনো দলের সাফল্যের জন্য আর যেটা দরকার তা হচ্ছে, টীমওয়ার্ক বা দলবদ্ধতা। দলবদ্ধতা মানে এই নয় যে, দলের 11জন খেলোয়াড়েরই পরস্পারের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকতেই হবে। থাকাটা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছাড়াও দলবদ্ধতার অর্থ হচ্ছে, তুমি গোটা দলের জন্য খেলবে, তোমার নিজের জন্য নয়। অনেক বেশি রান করো, ভালো কথা ; কিন্তু তাড়াতাড়ি করো, যাতে দলের সুবিধা হয়। দলবদ্ধতার তিনটে উদাহরণ আমি দেব, তা থেকে তোমরা বুঝতে পারবে, আমি কী বলতে চাইছি।

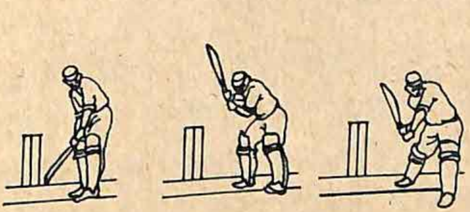
মনে করো ক আর খ ব্যাট করছে। ক একশ'রও বেশি রান করেছে। খ দিনের খেলা শেষ হবার 10 মিনিট আগে আউট হয়ে গেল। গ এসে ক'য়ের সঙ্গে যোগ দিল। এখন ক'য়ের কর্তব্য কী? এখানে টীমওয়ার্ক বা দলবদ্ধভাবে খেলার যে মনোবৃত্তি তা হ'ল খেলা শেষ হতে আর যে অল্প কয়েক মিনিট বাকি আছে, সেই সময়ে গ'কে বোলিং থেকে যতখানি সম্ভব রক্ষা করা। তার কখনই ভাবা উচিত নয় যে, সে যখন ব্যাট করতে এসেছিল তখন তাকে রক্ষা করার কেউ ছিল না এবং সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে, আর বোলিংয়ের সম্মুখীন হতে পারবে না। আবার তার একথাও মনে করা উচিত নয় যে, সে-ই ভালো ব্যাটসম্যান এবং গ'য়ের উইকেটের চেয়ে তার উইকেটের দাম বেশি। কারণ, তাহলে ক তখন তার নিজের জন্যই খেলতে থাকবে, দলের জন্য নয়।

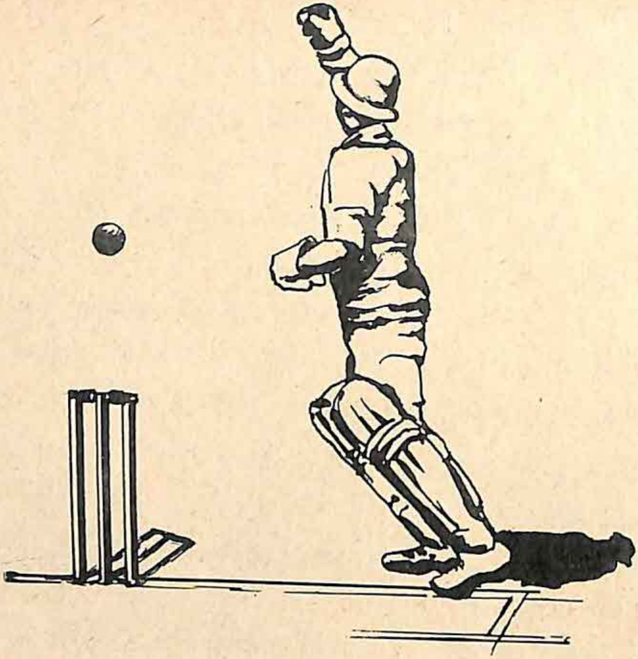
আর একটা উদাহরণ নাও। মনে করো, ক আর খ বল করছে। এমন অবস্থা আসতে পারে, যখন অধিনায়ক হয়তো চাইতে পারেন, তারা যেন কোনো উইকেট না নেয়। সেই সময় কখনই তাদের ঘুরে দাঁড়িয়ে অধিনায়কের সঙ্গে তর্ক করা কি তাঁর কর্তৃত্ব অস্বীকার করা উচিত নয়। 1937-38 সালে লর্ড টেনিসনের দল যখন ভারতে খেলতে এসেছিলেন, আমরা তখন মাদ্রাজে তাঁদের সঙ্গে চতুর্থ বেসরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলাম। কতকগুলো কারণে আমি তাড়াতাড়ি উইকেট নিতে চাই নি, কারণ, বিশেষ করে, বিদেশী দলটি তখন ফলো অন করার মতো অবস্থায় ছিলো। উইকেটগুলো নিতে গেলে ঐ দিন সন্ধ্যার সময়েই আমাকে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হ'ত,

সেটা বাঞ্ছনীয় ছিল না। আমি তাই অমর সিং আর মানকড়কে সেদিন কোনো উইকেট নিতে নিষেধ করলাম। তাঁরা আমার নির্দেশ মেনে নিলেন। পরের দিন দেখা গেল, আমার সিদ্ধান্ত ঠিক হয়েছে এবং আমরা এক ইনিংসে ম্যাচটা জিতে গেলাম। কিন্তু এই বোলার দুজন যদি বাধ্য না হতেন তাহলে আমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম না।

এবং, পরিশেষে, মাঠে অনেক সময় বল খুব উঁচুতে মারা হয়। ধরা যাক, এই ক্যাচ দুজন ফিল্ডার ধরতে পারে। ক বল থেকে অনেক দূরে আছে, কিন্তু সে একজন অসাধারণ ফিল্ডার। খ বলের কাছেই আছে, কিন্তু সে খুব ভালো ফিল্ডার নয়। টীমওয়ার্ক বা দলবদ্ধ ভাবে খেলার যে মনোবৃত্তি সেই মনোবৃত্তি অনুসারে ক'য়ের উচিত চিৎকার করে বলে ওঠা, 'সাইড' কিংবা 'মাইন'—এবং ক্যাচটা ধরা, যদিও সেটা তার পক্ষে হয়তো অনেক কঠিন হবে।

টীমওয়ার্ক আর ডিসিপ্লিনের যে কী সুবিধা, ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়রা এখন তা আমার সময়কার খেলোয়াড়দের চেয়ে বেশি বুঝতে পারছেন। আমি যখন খেলতাম তখন আমাদের মধ্যে অনেক অসাধারণ খেলোয়াড় ছিলেন। কিন্তু তাঁরা বেশির ভাগই এককভাবে খেলতেন, দল হিসাবে খেলতেন কদাচিৎ। আজ আমাদের খেলোয়াড়রা দল হিসাবেই খেলে থাকেন আর সেই কারণে আমাদের খেলা এখন অনেক ভালো হচ্ছে।





উইকেট কিপিং

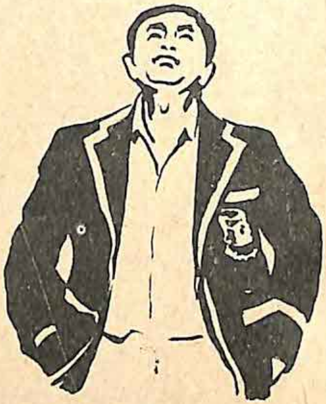
যখন কোনো দল ব্যাট করে না তখন সেই দলের উইকেট কিপারই মাঠের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি উইকেটের পেছনে দাঁড়ান এবং ব্যাটসম্যান যেসব বল মিস করেন কিংবা খেলেন না তার প্রত্যেকটা ধরেন। তাঁর হাত দুটো অত্যন্ত নির্ভুল হওয়া দরকার এবং তাঁর কাছে যেসব বল আসে তার অধিকাংশই আটকাবার ক্ষমতা তাঁর থাকা চই। যদি কোনো উইকেট রক্ষকের হাত থেকে ক্রমাগত বল পড়ে যেতে থাকে তাহলে ক্যাচের বলও তাঁর হাত থেকে পড়ে যেতে পারে। ব্যাটের কিনারায় বল এসে আঘাত করার পর থেকে হাতের দস্তানার মধ্যে সেই বল আটকে যাবার সময় হচ্ছে এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগের একভাগ। আর বলটা যখন ব্যাটে ঠেকে, উইকেট কিপার তখন নাও বুঝতে পারেন যে, বলটা আসছে এবং সেটা ধরতে

হবে। সেই কারণে উইকেট কিপারের সব সময় প্রস্তুত থাকা, তাঁর কাজে পূর্ণ মনঃসংযোগ করা এবং প্রতিটি বল ধরার জন্য তৈরী থাকা খুবই দরকার।

উইকেট কিপারকে শারীরিক দিক থেকেও খুবই কর্মক্ষম থাকতে হবে। অত্যন্ত চটপটেভাবে অফ আর লেগ সাইডে যাবার ক্ষমতাও তাঁর থাকা দরকার। এটা ভুল ধারণা, যেহেতু তাঁকে মাঠে দৌড়ুতে হয় না, সেই হেতু তাঁর চটপটে, কর্মতৎপর আর সম্পূর্ণ ফিট থাকার দরকার নেই। বরং দলের মধ্যে তাঁকেই সবচেয়ে বেশি ফিট থাকতে হবে। কারণ মাঠে তাঁর কাজেরই চাহিদা সব থেকে বেশি। যাঁরা বেশি ক্যাচ ধরেন কি বেশি ব্যাটসম্যানকে স্টাম্প আউট করেন, তাঁরাই বড়ো উইকেট কিপার নন, বরং যাঁদের হাতের দস্তানার মধ্যে থেকে খুব কম বল ফস্কায় তাঁরাই বড়ো উইকেট রক্ষক।

কোনো ভালো উইকেট কিপার কখনই তাঁর দস্তানা অন্য কাউকে ধার দেন না। সব সময় পরতে পরতে দস্তানার মধ্যে একটা কোটর তৈরি হয়ে যায়, যেটা হাতের চেটোয় সুন্দর খাপ খেয়ে যায়। অন্য কেউ যদি সেই দস্তানা ব্যবহার করেন তাহলে এই কোটরের আকৃতি নষ্ট হয়ে যায় এবং তখন আর আসল মালিকের হাতে তা ভালো খাপ খায় না।

ব্যাটসম্যান যখন খুব উঁচু কোনো ক্যাচ দেন তখন উইকেট কিপারের উচিত তা ধরার চেষ্টা করা। যদি বলটার ঠিক নিচেই আর একজন ফিল্ডার থাকেন, তবু। তার কারণ, তাঁর হাত থেকে বল ফস্কে পড়ে যাবার সম্ভাবনা খুব কম, যেহেতু তাঁর হাতে দস্তানা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে 'সাইড' কিংবা 'মাইন' বলে তাঁর চিৎকার করে ওঠা উচিত এবং ক্যাচটা ধরা উচিত।



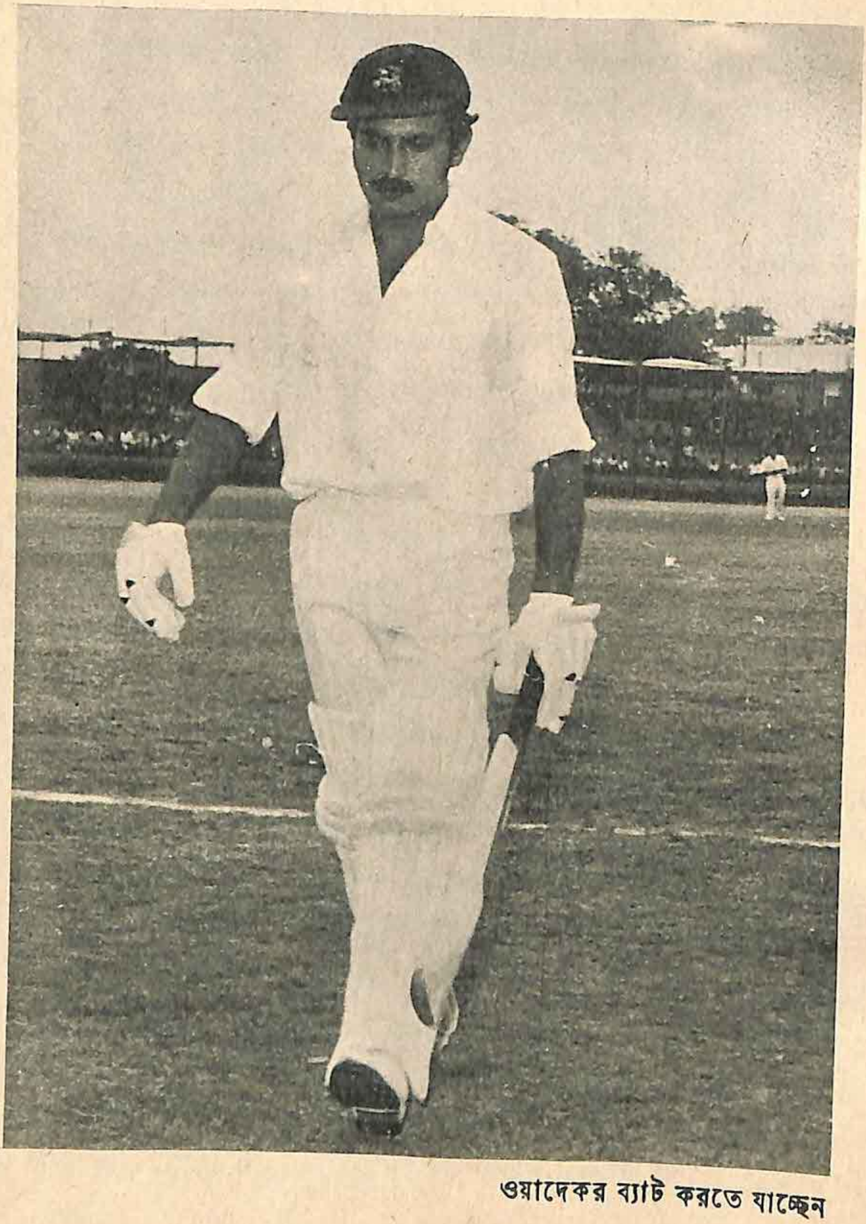
অধিনায়কত্ব

একজন ক্যাপ্টেন বা অধিনায়কের কাজ অত্যন্ত কঠিন। তিনি কীভাবে তাঁর দলকে চালনা করেন তার ওপরই তাঁর দলের কৃতিত্ব অনেকখানি নির্ভর করে। কেবল টসে জেতা, উপযুক্ত ব্যাটিং তালিকা রচনা করা, সুষ্ঠুভাবে বোলারদের পরিবর্তন করা এবং ঠিকভাবে ফিল্ড সাজানোই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নয়। এগুলো তাঁর নিয়মমাফিক কাজ। এগুলো ছাড়াও তাঁর হাজারটা কাজ আছে, যা তাঁর দলকে একটা সংগ্রামী দলে পরিণত করে এবং যার সাহায্যে তিনি তাঁর খেলোয়াড়দের কাছ থেকে তাঁদের সর্বোৎকৃষ্ট জিনিসটুকু আদায় করতে পারেন। তিনি যেভাবে তাঁর রণকৌশল স্থির করেন, খেলোয়াড়দের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং প্রত্যেকটা খেলোয়াড়ের ভালোমন্দ দিকগুলোর খবর রাখেন তাতে তাঁর দলকে কৃতিত্ব দেখাতে অনেকখানি সাহায্য করে।

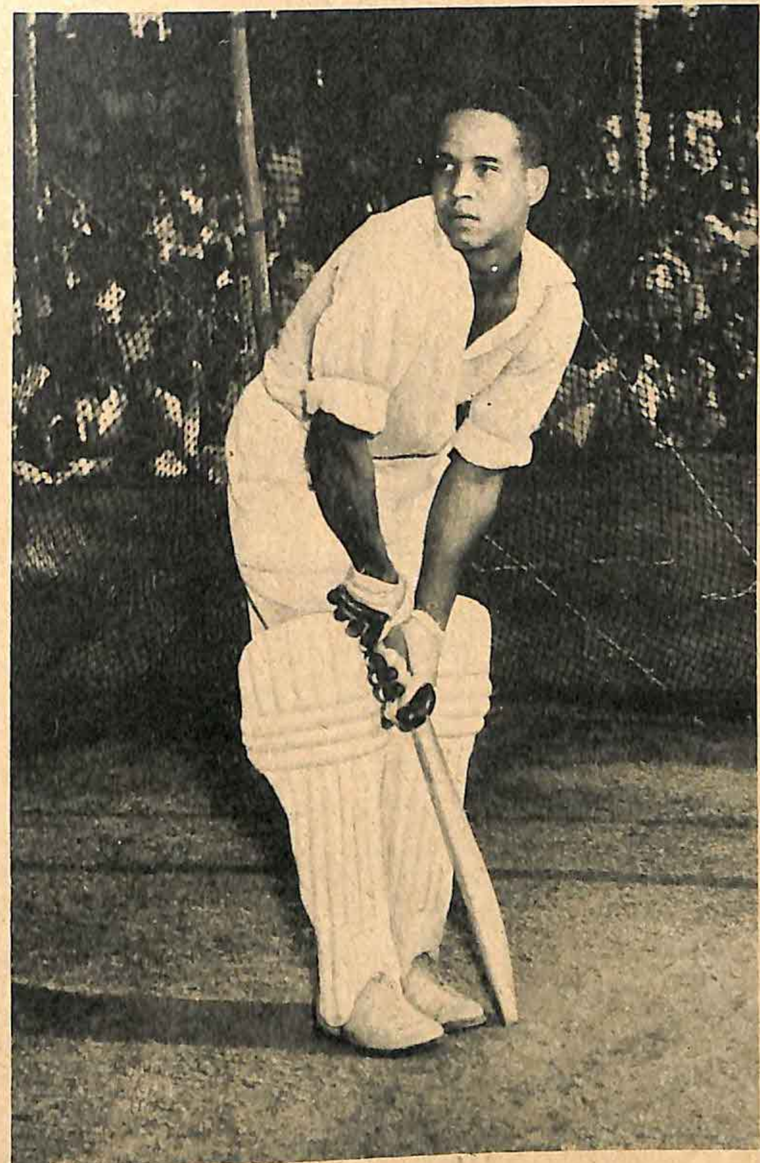
অধিনায়ক নিজে যে কাজ করতে প্রস্তুত নন সেই কাজ অন্য কোনো খেলোয়াড়কে করতে বলা তাঁর কখনই উচিত নয়। তিনি দলের জ্যেষ্ঠ ক্রিকেটারদের কাছ থেকে পরামর্শ চাইতে পারেন, কিন্তু শেষ সিদ্ধান্তটা তাঁর নিজেরই হতে হবে। তাঁকেই সমস্ত দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিতে হবে। উপ-অধিনায়ক বা অন্য কোনো খেলোয়াড়ের পরামর্শ যদি শেষে ভুল বলে প্রমাণ হয় তাহলে তাঁকে সেই দোষের ভাগী হতে হবে। অধিনায়ক নিজেকে দলের একজন খেলোয়াড় বলেই মনে করবেন, আলাদা কিছু নয়। দলের লোকদের প্রাপ্য প্রশংসা দিতে তাঁর কখনই কার্পণ্য করা উচিত নয়। যখনই প্রয়োজন হবে, কোনো খেলোয়াড়কে উৎসাহ দিতে এবং প্রেরণা দিতে তাঁকে তৈরী থাকতে হবে। যদি কোনো খেলোয়াড় কি ব্যাটে, কি বলে ভালো খেলতে না পারেন, অধিনায়ককে তার কারণ বুঝতে হবে এবং তাঁর প্রতি সহানুভূতি দেখাতে হবে ও যাতে তিনি ভালো খেলতে পারেন তার জন্য তাঁকে সাহায্য করতে হবে।

অধিনায়ক এমন একজন লোক, যাঁকে কেন্দ্র করে গোটা দল ঘোরে। তিনি কতখানি দলকে টানতে পারেন এবং পরিস্থিতি যখন খারাপের দিকে যায় তখন কতখানি তিনি শান্ত থাকতে পারেন তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। একজন অধিনায়ককে কেবল তাঁর জয়মাল্য দিয়ে বিচার করা হয় না, সমস্ত রকম পরিস্থিতিতে যেভাবে তিনি তাঁর দলের ভালো জিনিসগুলো আদায় করেন তা দিয়েও করা হয়। একজন বড়ো অধিনায়কের একটা অসাধারণ দৃষ্টান্ত ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, ইনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটারদের এমন ছাঁচে ঢালাই করে নিয়েছিলেন যে, তাঁরা পৃথিবীর যে কোনো দলকে পরাস্ত করতে পারতেন।

একজন অধিনায়ককে কখনই তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে চললে হবে না। তাঁর পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক যে, কোনো কোনো খেলোয়াড়ের সঙ্গে তাঁর বেশি বন্ধুত্ব থাকবে এবং মাঠের বাইরে তিনি কারও কারও সঙ্গে বেশি মিশবেন। কিন্তু খেলার মাঠে, এমন কি মাঠের বাইরে যখন তিনি সফরে আছেন তখনও সবার সঙ্গে তাঁর সমান আচরণ করা উচিত। একজন ভালো অধিনায়কের পক্ষে এটা মোটেই কঠিন নয়, কারণ, তাঁর কাছে দলই প্রথম,



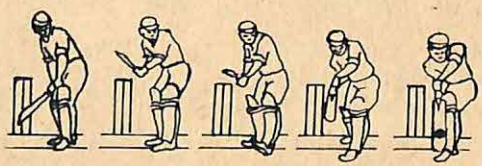
ওয়াদেকর ব্যাট করতে যাচ্ছেন



গারফিল্ড সোবার্স

তারপর আলাদা আলাদা খেলোয়াড়। একজন অধিনায়ককে তাঁর খেলোয়াড়দের সঙ্গে ব্যবহারে সম্পূর্ণ ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ হতে হবে। যে অধিনায়ক বিশেষ বিশেষ কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান তিনি যে কেবল অধিনায়ক হিসাবেই অসফল হন তা-ই নয়, খেলোয়াড়দের কাছ থেকেও কখনও সম্মান পাবেন না। তাঁকে মনে রাখতে হবে যে, তিনি সমানদের মধ্যে প্রথম মাত্র এবং তাঁর কাজ হচ্ছে, ন্যায়সম্মত পথে ম্যাচে জয় লাভ করা—আর সেই ন্যায়সম্মত পথগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে, খেলোয়াড়দের সঙ্গে শোভন আচরণ।

একজন অধিনায়ককে সমালোচনার ভয় করলে চলবে না। মর্যাদার সঙ্গে তাঁকে সমালোচনার মোকাবিলা করতে হবে। সমালোচনায় উত্তেজিত হয়ে উঠলে তাঁর চলবে না। তাঁর কিছু কিছু সিদ্ধান্ত কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে বাধ্য। কিন্তু তাঁর মনে যদি দৃঢ় প্রত্যয় থাকে যে, তিনি যা করেছেন তা ভালোর জন্যই করেছেন তাহলে অন্যে কী বলল না-বলল তাতে তাঁর ভয় পাওয়া উচিত নয়। তাঁর যে কর্তব্য, সে তাঁর দলের প্রতি, তাঁর দেশের প্রতি। নিজে বেশি সুযোগ না নিয়ে অন্যদের তাঁর বেশি সুযোগ দেওয়া উচিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর জন্য তাঁকে স্বার্থত্যাগও করতে হতে পারে। কিন্তু একজন ভালো অধিনায়কের কাছে প্রত্যাশা, তিনি তাঁর দলকে তাঁর ওপরে রাখবেন।



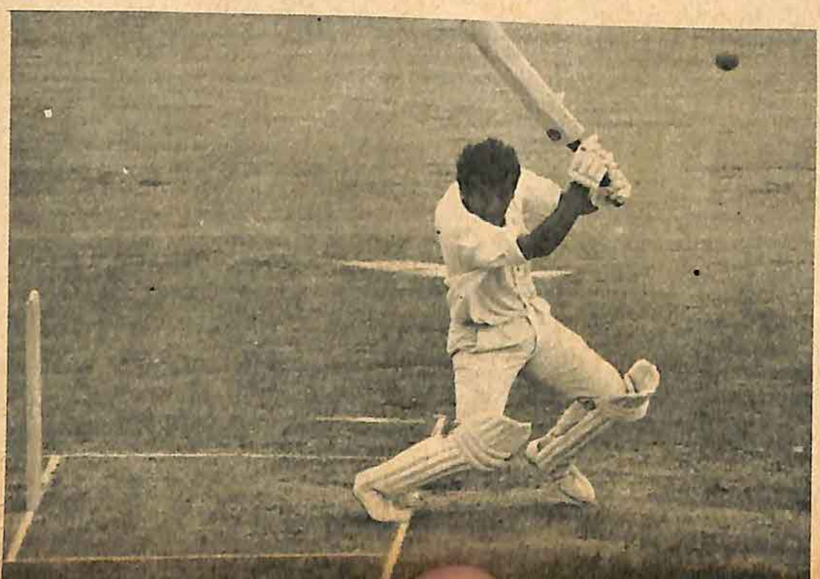


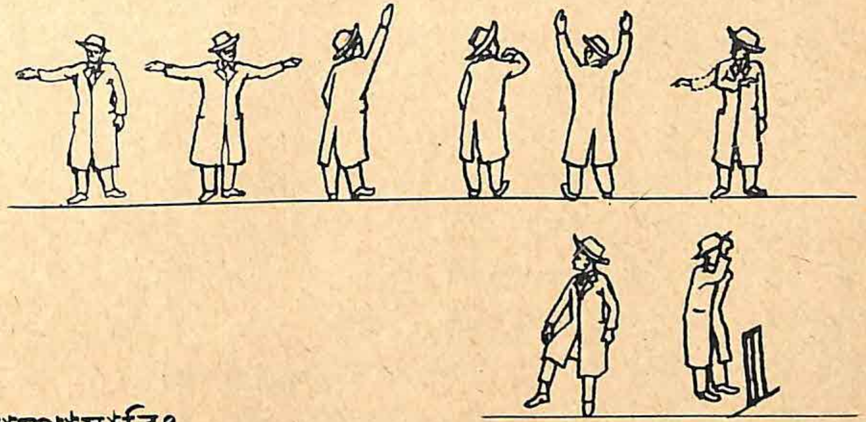
নির্বাচন

যাঁরা দল নির্বাচন করবেন তাঁদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে হবে। যোগ্যতা ছাড়া আর কোনো চিন্তাই তাঁদের মনে স্থান পাওয়া উচিত নয়—শুধু যোগ্যতাই হবে তাঁদের বিচারের মাপকাঠি। অবশ্য তাঁরা 11জন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কেই নির্বাচন করতে পারেন না, যদি-না সেই 11জনকে নিয়ে একটা ভালো দল তৈরি হয়। আগে দল, তারপরে খেলোয়াড়। নির্বাচকদের একটা সুষম দল নির্বাচন করতে হবে, যে দল তার কৃতিত্ব দেখাতে পারবে।

নির্বাচকদের কাজ এমন যে, তাতে প্রশংসা মেলে না। তাঁরা যত সতর্কভাবেই তাঁদের নির্বাচনের কাজ করুন না কেন, তাঁদের কাজের সমালোচনা হবেই। তাই বলে তাঁদের সাধ্যমতো উৎকৃষ্ট দল নির্বাচনে ভয় পেলে চলবে না। সাহসের সঙ্গে তাঁদের সমালোচনার মোকাবিলা করতে হবে।

নিৰ্বাচকসকল দলত উঠি অহা খেলুৱৈসকলক সুমুৱাই লোৱাৰ পক্ষপাতী হব লাগে। এটা ভাল দল যে নবীন খেলুৱৈসকলেৰেহে হব পাৰে আৰু কেতিয়াও প্ৰবীণসকলেৰে নহয় সেইটো তেওলোকে বুজিব পাৰিব লাগিব। যৌৱন আৰু অভিজ্ঞতাৰ উপযুক্ত সংমিশ্ৰনে তেওলোকক আৰু দেশক তুলি ৰাখিব। নবীন ক্ৰিকেটাৰসকলৰ টেষ্ট ক্ৰিকেট খেলাৰ জোগাৰে অভিজ্ঞতা নাই বুলি কোৱাৰ কোনো যুক্তি থাকিব নোৱাৰে। এজন ক্ৰিকেটাৰ অনভিজ্ঞ হলে তেও সৰ্বোচ্চ মানৰ ক্ৰিকেট খেলিলেহে সেই অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰিব। কেৱল নেটত আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ৰিকেটত খেলি থাকিলেই পটুতা লাভ নহয়। পৃথিবীৰ কেইজনমান সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ক্ৰিকেটাৰে তেওলোকৰ সৰু কালতেই পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাই ছিল আৰু নিৰ্বাচক-সকলে যদি তেওলোকক আগতীয়াকৈ সুবিধা নিদিলেহেতেন তেন্তে তেওলোকে ইমান সোনকালে কেতিয়াও প্ৰতিষ্ঠা লাভ নকৰিলেহেতেন। সুনীল গাভাস্কাৰ আৰু বিশ্বনাথেই আমাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ। আমাৰ নিৰ্বাচকসকলে যদি আমাৰ প্ৰবীণ ক্ৰিকেটাৰসকলৰ প্ৰতি দেখুৱাৰ আধাও অনুকম্পা নবীন প্ৰতিভাশালী খেলুৱৈৰ প্ৰতি দেখুৱায় তেন্তে অদূৰ ভবিষ্যতে এটা বিৰাট দল গঢ়ি তোলাত একো অসুবিধা নহব। যোৱা দুই বছৰত এনে নতুন প্ৰতিভাই কৃতিত্ব প্ৰদৰ্শণ কৰিছে আৰু তেওলোকক উপযুক্ত সুযোগ দিলে তেওলোকে তাতকৈয়ো বেছি কৃতিত্ব দেখুৱাব।

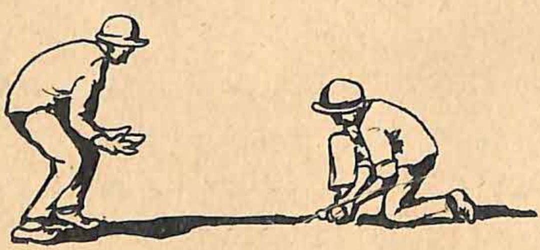




আম্পায়ারিং

আজকে পৃথিবীর যে কোনো দেশের আম্পায়ারদের সঙ্গে ভারতীয় আম্পায়ারদের তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু অন্যান্য দেশ ভারতীয় আম্পায়ারদের ভালো আম্পায়ার বলে মনে করে না। তার কারণ, অন্যান্য দেশের লোকদের কখনও তাঁদের দেখার সুযোগ হয় নি। আবার যখন কোনো বিদেশী দল এখানে খেলতে আসেন তখন আজকাল তাঁদের মধ্যে একটা দুঃখজনক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে, যদি তাঁরা খেলায় হেরে যান তাহলে এদেশী আম্পায়ারদের সমালোচনা করেন। কিন্তু আমাদের আম্পায়াররা যে কোনো বিদেশী আম্পায়ারের মতোই কর্তব্যনিষ্ঠ। তাঁরা নিরপেক্ষ, বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন, জ্ঞানবান এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী। তাঁরা নিশ্চয়ই ভুল করেন, কিন্তু পৃথিবীর কোন আম্পায়ার ভুল করেন না? এক সময় ইংল্যাণ্ডের আম্পায়ারদের সবচেয়ে ভালো বলা হ'ত, কিন্তু এখন অনেক দেশই তাঁদের আম্পায়ারিংকে উঁচু দরের নয় বলে এবং কখনও কখনও পক্ষপাতদুষ্ট বলেও সমালোচনা করতে আরম্ভ করেছেন।

সেদিন চলে গেছে, যখন একজন ব্যাটসম্যান আম্পায়ারের রায়কে চূড়ান্ত এবং অবশ্য পালনীয় বলে মনে করতেন। আজকাল আম্পায়ার আউট বলে রায় দেবার পরও ব্যাটসম্যানকে উইকেটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তার কারণ, ব্যাটসম্যান দর্শকদের বোঝাতে চান যে, তিনি আম্পায়ারের রায়ে সন্তুষ্ট নন। এটা যে কেবল ব্যাটসম্যানরাই করেন তা-ই নয়, ফিল্ডার আর বোলাররাও করে থাকেন। আম্পায়ার যখন কোনো বোলারের আবেদন নাকচ করে দেন তখন কখনও কখনও তার প্রতিবাদে বোলার হাত ছোঁড়েন, উইকেট রক্ষক তাঁর মাথার টুপি খুলে মাটিতে ফেলে দেন, অন্য খেলোয়াড়রা নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করেন এবং কেউ কেউ আম্পায়ারের কাছে ছুটে গিয়ে কৈফিয়ৎ চান, কেন ব্যাটসম্যানকে নট-আউট দেওয়া হ'ল। এতে কিন্তু ডিসিপ্লিনের অভাব প্রকাশ পায়। ক্রিকেটের সঙ্গে যে খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি জড়িয়ে রয়েছে তার সঙ্গে এটা মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ক্রিকেট এমন একটা খেলা, যাতে আম্পায়ারের রায় সম্বন্ধে কখনই প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। অন্যদের মতো আম্পায়ারদেরও ভুল হয়, কিন্তু ডিসিপ্লিন আর খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির দাবি হচ্ছে, প্রতিকূল রায়ও উদারভাবে মেনে নিতে হবে। আম্পায়ারদের কাজ নির্বাচকদের কাজের চেয়েও বেশি প্রশংসাবিহীন। তাঁদের ভুলগুলোই কেবল সবাই লক্ষ্য করে, তাঁদের নির্ভুল রায়ের জন্য কেউ তাঁদের প্রশংসা করে না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আম্পায়াররা সুচারুভাবে তাঁদের কাজ করে যাচ্ছেন এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, পক্ষপাতশূন্যভাবে করে যাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখা উচিত।







মাঠ

সর্বোচ্চ শ্রেণীর ক্রিকেটের জন্য মাঠ ঘাসে ঢাকা হওয়া দরকার। বল যাতে দ্রুত, সমানভাবে গড়িয়ে যেতে পারে তার জন্য মাঠ মসৃণ হওয়া চাই। কিন্তু প্রত্যেক দেশের আবহাওয়া আলাদা আলাদা বলে উইকেটের কোনো একটা নির্দিষ্ট মানদণ্ড স্থির করা যায় না। তবে আজকাল সমস্ত টেস্ট ম্যাচই ঘাসে ঢাকা উইকেটে খেলা হয়, ম্যাটিংয়ের ওপরে আর হয় না।

আগে মাঠের আয়তন অনুযায়ী বাউণ্ডারির পার্থক্য হ'ত। তার ফলে কোনো মাঠের বাউণ্ডারি হ'ত 75 গজ, আবার কোনো মাঠের 85 গজ। এখন একটা নির্দিষ্ট বাউণ্ডারি স্থির করে নেওয়া হয়েছে। এখন গোটা পৃথিবীতেই কেবল 75 গজের বাউণ্ডারিওয়ালা মাঠে টেস্ট ম্যাচ খেলা হয়ে থাকে।

তৈরী উইকেট শক্ত আর টেঁকসই হওয়া দরকার এবং তাতে বল যেন এত উঁচুতে ওঠে যাতে বোলার মনে করতে পারেন যে, ব্যাটসম্যানকে আউট

করার সুযোগ তাঁর আছে; আবার ব্যাটসম্যানও ভাবতে পারেন যে, উইকেটের চারপাশেই তিনি ভালো স্ট্রোক করতে পারবেন। এসব হচ্ছে, টেস্ট ম্যাচের পক্ষে আদর্শ মাঠ। কিন্তু এই ধরনের মাঠ কদাচিৎ কোনো দেশে দেখা যায়। সাধারণত যা দেখা যায় তা হচ্ছে, উইকেটটা হয় ব্যাটসম্যানদের পক্ষে খুব বেশি অনুকূল, নয়তো কখনও কখনও—উইকেটটা ঠিকমতো তৈরি না হলে—তা বোলারদের পক্ষে খুব বেশি অনুকূল। দুটোই খারাপ। যখন বোলার আর ব্যাটসম্যান উভয়েই মনে করতে পারেন যে, তাঁদের জেতার সম্ভাবনা সমান-সমান তখনই ভালো ক্রিকেট খেলা হয়। কিন্তু কদাচিৎই আমরা সে রকম নিখুঁত উইকেটের কথা শুনে থাকি। তার কারণ, উইকেটের ভালোমন্দ নির্ভর করে মাটির প্রকৃতির ওপর আর যাঁরা উইকেট তৈরি করেন তাঁদের দক্ষতার ওপর।

আমরা প্রায়ই শুনতে পাই, অমুক দেশ তার বোলারদের অনুকূল করে পিচ তৈরি করেছে। সত্যিই তা-ই করে। কিন্তু এটা ক্রিকেটের সর্বোচ্চ ঐতিহ্যের অনুসারী নয়।

এক সময় অষ্ট্রেলিয়ায় সমস্ত প্রথম শ্রেণীর ম্যাচই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত খেলা হ'ত। তার ফলে অনেক বড়ো বড়ো স্কোর হ'ত এবং ব্যাটিং পক্ষ কদাচিৎ ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করতেন। তখন নতুন নতুন রেকর্ড তৈরি হ'ত, পুরনো রেকর্ডগুলো ভাঙত—কিন্তু দর্শকরা ক্লান্ত হয়ে পড়ত এবং ক্রমশ তাদের সংখ্যা কমে যেত। একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত আছে : দর্শকরা আনন্দ পাক আর না-ই পাক, হারজিতের চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত খেলা চলার রীতি অনুযায়ী 1926-27 সালের এক ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়ার ভিকটোরিয়া 1,107 রান করেছিল। শিগ্‌গিরই অষ্ট্রেলিয়া এই ব্যবস্থার ত্রুটি বুঝতে পারল। এখন সমস্ত ম্যাচই একটা নির্দিষ্ট সময়-সূচী অনুযায়ী খেলা হয়।

মাঠ এত বড়ো হওয়া দরকার, যাতে অনেক বেশি টেস্ট ম্যাচ দর্শকের স্থান সঙ্কুলান হতে পারে। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ক্রিকেট মাঠ আছে



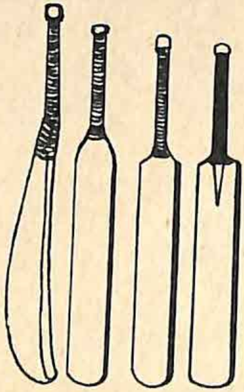
বোম্বাইয়ের ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে। সেখানে 120,000 দর্শকের জায়গা হতে পারে। 1956 সালে সেখানে ওলিম্পিকের খেলা হবার আগে ঐ মাঠে 95,000-এর কিছু বেশি লোকের জায়গা হ'ত। কিন্তু ওলিম্পিকের বছরে ঐ মাঠের আসনসংখ্যা বাড়িয়ে করা হ'ল 1,20,000। মেলবোর্নে এক দিনের খেলার রেকর্ড উপস্থিতি হচ্ছে, 90,800। সেটা 1960-61 সালে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার খেলায়। ঐ মাঠে একটা পূর্ণ টেস্ট ম্যাচে মোট সর্বোচ্চ উপস্থিতির সংখ্যা হচ্ছে 3,50,534। সে 1936-37 সালে, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার খেলায়।

অধিকাংশ মাঠেই দর্শকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা

খুব আধুনিক নয়। তার কারণ, প্যাভিলিয়নগুলো বেশির ভাগই পুরনো। এখন সবচেয়ে আধুনিক সুখসুবিধার ব্যবস্থা আছে বার্মিংহাম (ইংল্যাণ্ড)-এর এজব্যাস্টন মাঠে। এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একটি নতুন স্টেডিয়াম আর প্যাভিলিয়ন তৈরি হয়েছে। এখানে ক্রিকেট খেলোয়াড়, কমেন্টেটর, সাংবাদিক আর দর্শকদের জন্য যেসব ব্যবস্থা রয়েছে তা অনেক বেশি আধুনিক। একটা বিশেষ ব্যাপারে ভারত অন্যসব ক্রিকেট-দেশের চেয়ে এগিয়ে আছে। সে হচ্ছে, বোম্বাইয়ে ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ার প্যাভিলিয়নের ভেতরেই ক্রিকেটারদের থাকার ব্যবস্থা আছে। ক্রিকেট খেলোয়াড়দের পক্ষে এটা একটা মস্ত সুবিধা। সকালে তাঁরা অনেক দেরিতে ঘুম থেকে উঠতে পারেন, এমন কি সাড়ে 9টাতেও। তারপর সওয়া 10টার মধ্যেই তাঁরা নেটে পৌঁছুতে পারেন এবং সাড়ে 10টাতেই ম্যাচ খেলা আরম্ভ করতে পারেন। সন্ধ্যায় খেলা শেষ হবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাঁরা ঘরে ফিরে চা খেতে এবং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে পারেন। এতে করে তাঁরা অটোগ্রাফ শিকারীদের কবল থেকেও রক্ষা পেতে পারেন এবং খেলার শেষে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে পারেন।

আমাদের দেশে যেভাবে ক্রিকেটামোদীদের সংখ্যা বাড়ছে তাতে আমাদের পাঁচটা টেস্ট সেন্টারেরই আসনসংখ্যা বাড়াতে হবে। স্থানাভাবের দরুণ একমাত্র 1972-73 সালেই প্রত্যেকটা মাঠ থেকে অন্তত 15,000 করে দর্শককে ফিরে যেতে হয়েছে।





দর্শক

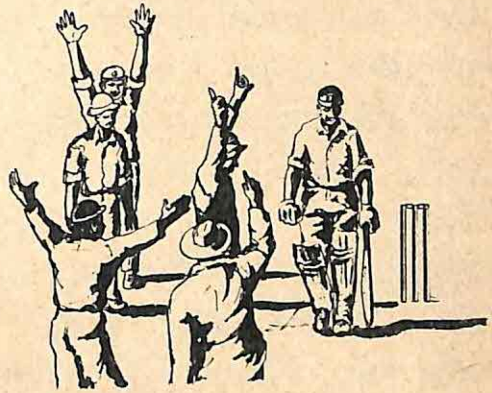
সারা পৃথিবীতেই দর্শকরা একপেশে। এটা স্বাভাবিক। পৃথিবীর যে সাতটি দেশ ক্রিকেট খেলে তার মধ্যে ইংল্যাণ্ডের দর্শকরাই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি নিরপেক্ষ এবং শান্ত। সবচেয়ে বেশি হৈচৈ করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর ভারতের দর্শকরা। অনেক সময় তারা আয়ত্তের বাইরেও চলে যায়। অস্ট্রেলিয়ার দর্শকরাই সবচেয়ে বেশি সমঝদার। তারা যেসব ঠাট্টাবিদ্রূপ করে তার মধ্যেও বুদ্ধির ছাপ থাকে। যে খেলোয়াড়ের খেলা নিস্তেজ হয় তাঁকে তারা বাক্যবাণে জর্জরিত করে তোলে, এমন সব মন্তব্য করে, যাতে খেলার মধ্যে কৌতুক সৃষ্টি হয়।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। 1954-55 সালে অস্ট্রেলিয়ায় এক টেস্ট ম্যাচে একজন বিশেষ ব্যাটসম্যান যখন টইসনের বলের সম্মুখীন হতে যাচ্ছিলেন তখন তিনি এত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন যে, প্যাভিলিয়ন গেট পেরুবার পর তার

হুড়কোটা লাগাতে পারছিলেন না। দর্শকদের মধ্য থেকে তখন একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "খোলাই থাক দোস্ত, তুমি ওখানে তো বেশিক্ষণ থাকবে না।" আর-একবারের এক ঘটনা বলি। একজন ব্যাটসম্যান অনেকগুলো বল খেলেছেন এবং মিস করেছেন। তখন একজন ঠাট্টা করে উঠল, "ওকে ওখানে একটা গ্র্যাণ্ড পিয়ানো পাঠিয়ে দাও এবং দেখো, সেটায় অন্তত কিছু খেল দেখাতে পারে কিনা।" একবার এক তরুণ ইংরেজ ব্যাটসম্যান অনেকক্ষণ ধরে ব্যাট করছিলেন, কিন্তু একটাও রাণ তুলতে পারছিলেন না। হঠাৎ একটা বল তিনি অফসাইডে মেরে বসলেন এবং একটা সিঙ্গলের জন্য জোর ছুট লাগালেন। সঙ্গে সঙ্গে একজনের চিৎকার শোনা গেল, "হো, দৌড়েছে!"

ভারতীয় দর্শকরা এত হৈচৈ করে যে, খেলোয়াড়দের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। বল যখন করা হচ্ছে তখনও তারা গোলমাল করে। ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, কিন্তু বিদেশী খেলোয়াড়দের এতে দারুণ অসুবিধা হয়, তাঁরা খেলায় মন বসাতে পারেন না। অবশ্য খানিকক্ষণ পরে তাঁরা মানিয়ে নেন। কিন্তু তবু আমাদের দর্শকরা আর একটু শৃঙ্খলাপরায়ণ আর সংযত হলে খেলার পক্ষে ভালো হয়।

অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডের দর্শকরা অত্যন্ত ভদ্র, খুবই শান্ত—এবং তাদের ব্যবহারও সুন্দর। তারা দু' পক্ষের খেলাই উপভোগ করে, এবং কোনো দেশের প্রতিই তাদের পক্ষপাতিত্ব নেই। তারা হৈ চৈ না করেই আনন্দ প্রকাশ করে। কোনো কিছু ভুল হলে কি খেলা অত্যন্ত নিষ্প্রাণ হলে তাদের প্রতিবাদের পদ্ধতি হচ্ছে, শুধু আস্তে করে হাততালি দেওয়া—তার বেশি কিছু না। ইংল্যাণ্ডে খুব কদাচিৎই দর্শকরা খেলায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকে—এবং বিশ্বাস করো, ইংল্যাণ্ডের মাঠে খেলে সত্যিই খুব আনন্দ পাওয়া যায়। দর্শকরা যখন কারও খেলায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হয় তখন খেলার শেষে খেলোয়াড়রা প্যাভিলিয়নে ফিরে যাবার সময় তারা উঠে দাঁড়িয়ে সেই খেলোয়াড়কে কিংবা তাঁর দলকে অভিনন্দন জানায়। আমার ক্রিকেট-জীবনের কতকগুলো আনন্দ উজ্জ্বল মুহূর্তও এভাবে কেটেছে ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট মাঠে।



খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি

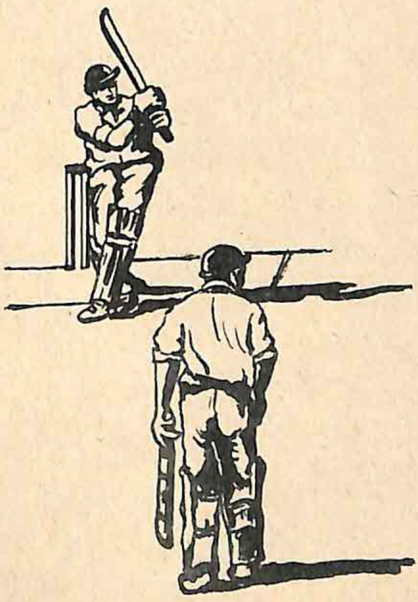
ক্রিকেট এমন একটা খেলা, যা কেবল ক্রিকেটের আইন অনুসারেই খেলা হয় না, অনেকটা খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি নিয়ে খেলা হয়। কেউ যাতে কোনো বিশেষ পরিস্থিতির অন্যায় সুযোগ নিতে না পারেন তার জন্যই ক্রিকেটের আইন তৈরি হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সব সময় আক্ষরিকভাবে সেই আইন মেনে চলতে হবে। যখন একটা সঙ্কটজনক অবস্থার উদ্ভব হয় তখন শুধু নিজেকে একবার জিজ্ঞাসা করতে হয়, "এটা কি ঠিক?" অন্যভাবে বলা যেতে পারে, যা ঠিক তা-ই ক্রিকেট এবং যা ঠিক নয় তা ক্রিকেট নয়। সেইজন্যই যখন কোনো অন্যায় হয় তখন বলা হয়, "এটা ক্রিকেট নয়।" আমরা কিন্তু কখনই বলি না, "এটা টেনিস নয়" কিংবা "এটা হকি নয়" অথবা "এটা ব্যাডমিণ্টন নয়"। কেবল ক্রিকেটের ক্ষেত্রেই কথাটা ব্যবহার করা হয়। এতেই বেশি করে বোঝা যায় যে, "সততা" আর "ক্রিকেট" সমার্থক।

ক্রিকেটের ক্ষেত্রে খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির অনেক অসাধারণ দৃষ্টান্ত আছে। 1909 সালে ইংল্যাণ্ডের লীডসে জ্যাক হব্‌স্ ইংল্যাণ্ডের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলছিলেন। হঠাৎ একটা বল তিনি মিডউইকেটে বাউণ্ডারিতে মারলেন এবং সেই স্ট্রোকের সময় তাঁর ডান প্যা'টা স্টাম্পে লেগে একটা বেল পড়ে গেল। একটা আপীল করা হয়েছিল, কিন্তু আম্পায়ার দুজনের একজনও ঘটনাটা দেখেন নি, কারণ তাঁদের চোখ ছিল বাউণ্ডারির দিকে তীব্র বেগে ছুটন্ত বলের দিকে। জ্যাক হব্‌স্‌কে তাঁরা নটআউট দিলেন। জ্যাক হব্‌স্ কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন যে, উইকেটে লাগার দরুণ তিনি সত্যি সত্যি আউট হয়েছেন। তাই দুটো বলের পরে তিনি একটা সোজা বলের সামনে থেকে তাঁর ব্যাটটা সরিয়ে নিলেন এবং নিজেকে তিনি বোল্‌ড্ আউট হতে দিলেন। এটা খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির একটা উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

1964-65 সালে কেন ব্যারিংটন দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংল্যাণ্ডের হয়ে তৃতীয় টেস্টে খেলছিলেন। 49 রানের সময় উইকেটের পেছনে তিনি কট-আউট হয়ে যান। কিন্তু আম্পায়ার তাঁকে নট-আউট বলে ঘোষণা করেন। ব্যারিংটন কিন্তু টের পেয়েছিলেন যে, বলটা তিনি ছুঁয়েছেন। তাই তিনি মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করলেন, তারপর প্যাভিলিয়নের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। তিনি প্রস্থান করলে পরে আম্পায়ার তাঁকে আউট বলে ঘোষণা করলেন। টেস্ট ক্রিকেটে এটাই একমাত্র দৃষ্টান্ত, সেখানে একজন ব্যাটসম্যানকে নট-আউট দেওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে আউট ঘোষণা করেছেন এবং ক্রীজ ছেড়ে চলে গেছেন। খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির এই ধরনের দৃষ্টান্ত দুর্লভ হলেও তা অনুকরণীয়।

খেলা, বিশেষ করে বহিরঙ্গনের খেলা আমাদের এমন কিছু শেখায়, যা জীবনে কাজে লাগে। কিন্তু অন্যান্য খেলার চেয়ে ক্রিকেটের কাছেই আমাদের অনেক বেশি শেখার আছে। ক্রিকেট আমাদের ডিসিপ্লিন আর

টীমওয়ার্ক শেখায় ; শরীরটাকে কর্মক্ষম রাখতে শেখায়—শুধু ম্যাচের পাঁচটা দিনের জন্য নয়, গোটা মরশুমের চার-পাঁচটা মাস। এই খেলা আমাদের নম্র হতে শেখায়, কারণ একদিন হয়তো তুমি প্রচণ্ড সাফল্য অর্জন করতে পারলে, কিন্তু ঠিক তার পরের দিনই তুমি হয়তো সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিলে। আবার এই খেলা আমাদের শেখায়, বিপক্ষ দলের ক্ষমতাকে কখনও খাটো করে দেখতে নেই। ক্রিকেটের মাঠে আমরা যেসব শিক্ষা পাই তা আমাদের জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে সব সময়েই কাজে লাগে। একবার এক বিরাট জয় লাভের পর ডিউক অভ ওয়েলিংটন যে বলেছিলেন, "ওয়াটারলু যুদ্ধের যে জয়, সে ইটনের খেলার মাঠেই হয়েছিল", সে অকারণে নয়। ক্রিকেট সম্বন্ধে এত বড়ো প্রশংসাবাক্য আর কখনও শোনা যায় নি।



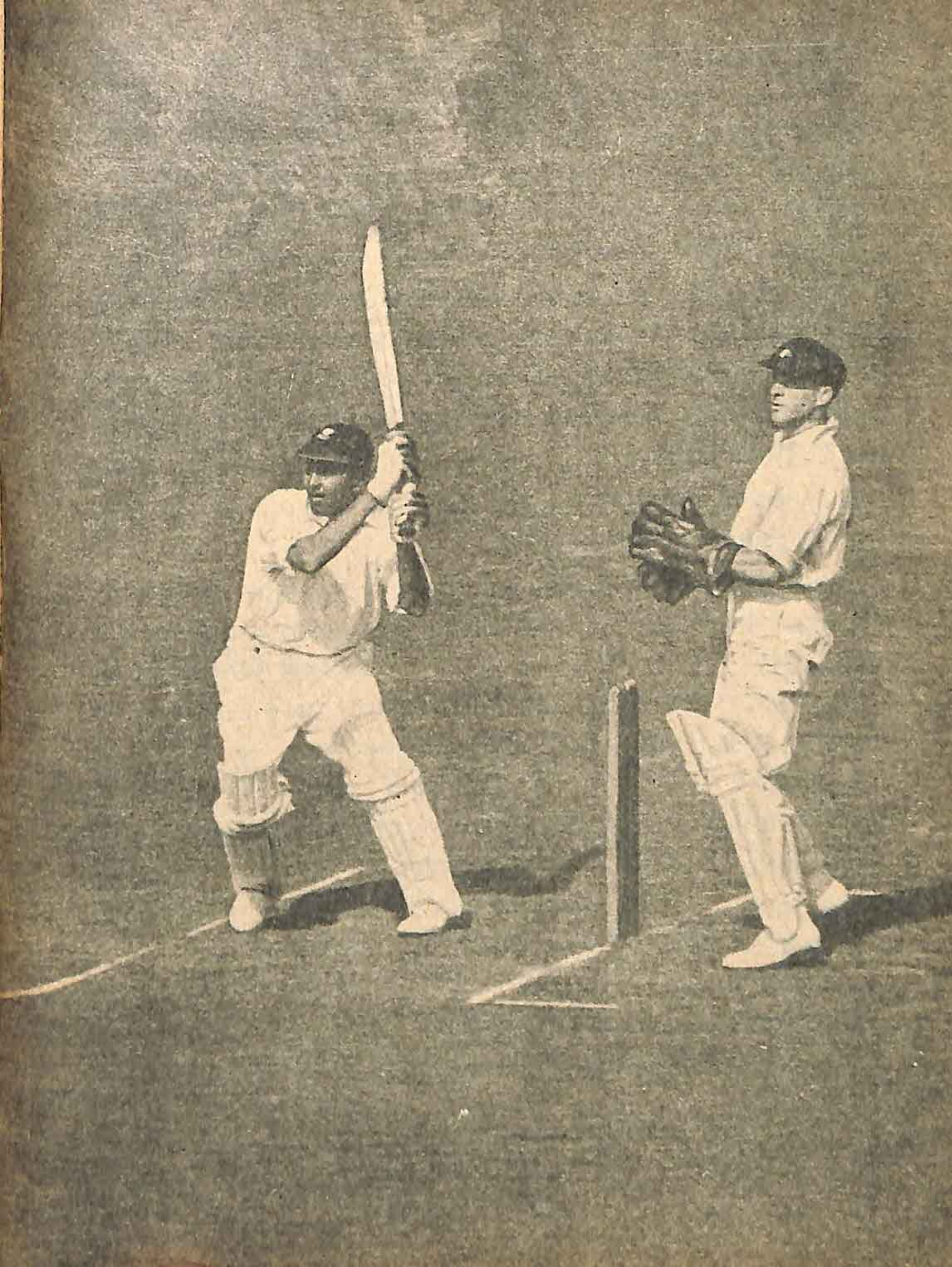


মেজাজ

ক্রিকেট কেবল ধৈর্য, দক্ষতা, নিপুণতা আর কৌশলের খেলা নয়। একজন খেলোয়াড়ের মধ্যে এসবই থাকতে পারে, তবু তিনি উন্নতির শিখরে না-ও পৌঁছুতে পারেন। ক্রিকেটে সাফল্য অর্জনের জন্য মেজাজও দরকার। খুবই দরকার। যে খেলোয়াড় একটুতেই ঘাবড়ে যান, তিনি বিশেষ উন্নতি করতে পারেন না। বড়ো ম্যাচ খেলার যে মেজাজ তা তাঁর থাকে না। কিন্তু বড়ো ক্রিকেট ম্যাচে এই মেজাজটা খুবই দরকার, কারণ, বড়ো বড়ো টেস্ট ম্যাচে বড়ো বড়ো খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলতে হয় এবং সেইসব খেলায় উত্তেজনাও থাকে খুব।

অনেক বছর আগে যখন ইংল্যাণ্ডের বড় দুই কাউন্টি ল্যাঙ্কাশায়ার আর ইয়র্কশায়ারের মধ্যে ম্যাচ খেলা হ'ত তখন এত বেশি উত্তেজনা সৃষ্টি হ'ত এবং ক্রিকেটের মান এত বেশি উন্নত দেখা যেত যে, কোনো কারুর বিশেষ ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় পেলে নির্বাচকরা তাকে টেস্ট ক্রিকেটে খেলার যোগ্য বলে মনে করতেন।

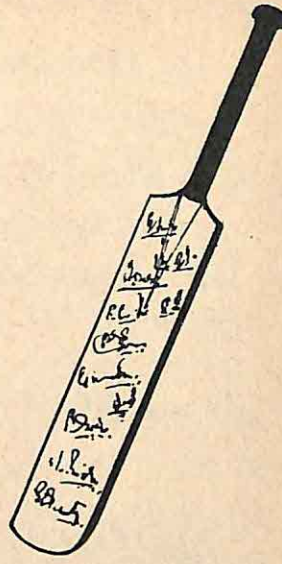
দলীপসিংজী ছয় মারছেন →



এই মেজাজের একটা দিক এখন আমি ব্যাখ্যা করব। একবার আমি আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় কে. এস. দলীপসিংজীর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "যখনই আমি কোনো ইনিংস শুরু করতে যাই—তা সে টেস্ট ম্যাচেই হোক কি রণজি ট্রফি ক্ষিকশ্চারেই হোক বা আমার ছোট্ট ক্লাবের খেলাতেই হোক—কেন আমি ঘাবড়ে যাই?' তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমার তখন কী মনে হয়। আমি বলেছিলাম, "আমি যখন উইকেটের দিকে এগিয়ে যেতে থাকি আমার তখন মনে হতে থাকে, প্রথম ওভারের পর আমি কি ওখানে থাকতে পারব, না আমাকে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসতে হবে?" দলীপসিংজী আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কতক্ষণ তোমার এই রকম মনে হতে থাকে, বিজয়?" আমি উত্তর দিয়েছিলাম, "যতক্ষণ না বোলার প্রথম বল করার জন্য দৌড়ুতে আরম্ভ করেন। তারপর এই ভাবটা দূর হয়ে যায়। তখন আমার একমাত্র চিন্তা থাকে বল, বোলার আর আমার ব্যাট।"

দলীপসিংজী মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "এটা নার্ভাস টেনশন মাত্র। এটা ভালো, কারণ বড়ো ম্যাচ খেলার জন্য যে মনঃসংযোগ দরকার, প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই তার চাপা উত্তেজনা বোধ করা উচিত এবং নিজেকে বারবার জিজ্ঞাসা করা উচিত, তিনি ভালো খেলতে পারবেন তো? এর ফলে পূর্ণ মনঃসংযোগ আসে। সর্বোচ্চ শ্রেণীর ক্রিকেটে সাফল্য অর্জন করতে গেলে তা খুবই দরকার। যাঁরা নিজেদের ব্যাটিং সম্বন্ধে অত্যধিক আস্থাবান এবং আত্মতুষ্ট তাঁরা বেশি মনঃসংযোগ করেন না। ফলে উইকেট হারান। খেলার সারাক্ষণ যদি তোমার নার্ভাসনেস থাকে তাহলে সেটা খারাপ। কিন্তু নার্ভাস টেনশন ভালো। এ নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না, বিজয়। কারণ, একজন ক্রিকেটারের খেলায় যা-কিছু ভালো, নার্ভাস টেনশনে তা বেরিয়ে আসে।"

আমি এক নতুন কথা শুনলাম। এর পরে আর কখনও আমি উইকেটে যাবার সময়কার নার্ভাসনেস নিয়ে ভাবিনি। দলীপসিংজীর উপদেশে আমি কেবল ক্রিকেট খেলাতেই প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হইনি, জীবনের অন্য বহু ক্ষেত্রেও হয়েছি।



একটি স্মরণীয় ঘটনা

1933-34 সালে আমি প্রথম ভারতে টেস্ট ক্রিকেট খেলার সুযোগ পাই। সেই সময় ডগলাস জার্ডিনের অধীনে এম. সি. সি. দল আমাদের দেশে তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলতে আসে। সৌভাগ্যবশত, আমি এত ভালো খেলেছিলাম যে, তিনটি টেস্টেই আমার স্থান ছিল।

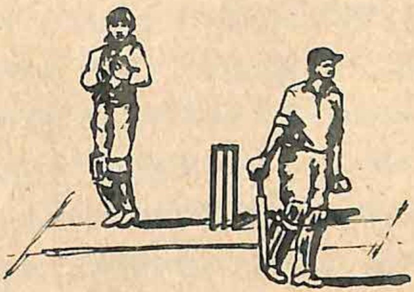
এইসব টেস্ট ম্যাচের সময় আমার ছোটো বোন লক্ষ্মী বিদেশী খেলোয়াড়দের অটোগ্রাফ নেবার জন্য আমাকে একটা অটোগ্রাফ বই দিয়েছিল। সেই বইয়ের একটা পৃষ্ঠায় আমি সযত্নে লিখে রেখেছিলাম, 'এম. সি. সি. ট্যুরিং টীম—1933-34'। এই শিরোনামের তলায় আমি ভারতে আগত ঐ 16জন খেলোয়াড়েরই অটোগ্রাফ নিয়েছিলাম।

M.C.C. Touring Team

1933 34

1. D.R. Jardine
2. C.F. Walters
3. B.H. Valentine
4. H. Elliott.
5. E.W. Clark
6. L. Townsend.
7. H. Verity
8. A. Mitchell.
9. C.J. Barnett.
10. C.S. Marriott.
11 W. Worthington
12 M.S. Nichols
13. A.H. Bakewell
14. R.J. Gregory
15. J. Langridge
16 J.H. Human
17 W.H.V. Levett

এর দু মাস পরে গান্ধীজীর একটা অটোগ্রাফ নেবার জন্য তাঁর কাছে যাবার একটা উপলক্ষ্য আমার ঘটে গেল। গান্ধীজীর একটা অটোগ্রাফ পাবার জন্য আমার বোন খুবই উৎসুক ছিল। গান্ধীজীর কাছে গিয়ে যখন আমি আমার অনুরোধ জানালাম তখন সেখানে অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজী আমার অনুরোধ শুনে একটুখানি হাসলেন। তারপর অটোগ্রাফ বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগলেন—এবং শেষে এম. সি. সি. খেলোয়াড়দের নামের নিচে লিখলেন, '17. এম. কে. গান্ধী'। আমি তৎক্ষণাৎ এই মানুষটির মহত্ত্ব বুঝতে পারলাম। বুঝতে পারলাম, কেন তিনি এম. সি. সি. খেলোয়াড়দের নামের তলায় নিজের নাম লিখলেন। এম. সি. সি. দলের সপ্তদশ সদস্য হিসাবে সেই অবিস্মরণীয় স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, যদিও ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি বৃটিশ সরকারের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামে প্রস্তুত, তবু ইংল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর কোনো বিবাদ নেই এবং ইংল্যাণ্ডের এক ক্রিকেট দলের সপ্তদশ সদস্য হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিতেও তিনি কুণ্ঠিত নন।



1933-34 সালে এম. সি. সি. দলের একজন সদস্য হিসাবে গান্ধীজীর অটোগ্রাফ



ক্রিকেটের কাছে আমি কিভাবে ঋণী

অনেক খেলোয়াড়কেই আমি বলতে শুনি, "দেখো, খেলার জন্য আমি কত করলাম, আর তার বদলে কী পেলাম !" খুব কম ক্রিকেট খেলোয়াড়ই—এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য খেলোয়াড়রাও—বোঝেন যে, খেলোয়াড়রা খেলার জন্য যতখানি করেন তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁরা খেলার কাছ থেকে পান। যেসব খেলোয়াড় বলেন, খেলার জন্য তাঁরা অনেক করেছেন তাঁরা নিজেদের সম্বন্ধে বড়ো বেশি করে ভাবেন। তাঁরা বোঝেন না যে, খেলা তাঁদের জন্য কতখানি করেছে। তোমরা যাতে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পারো তার জন্য এখন আমি তোমাদের বলছি, ক্রিকেটের কাছে আমি কীভাবে ঋণী।

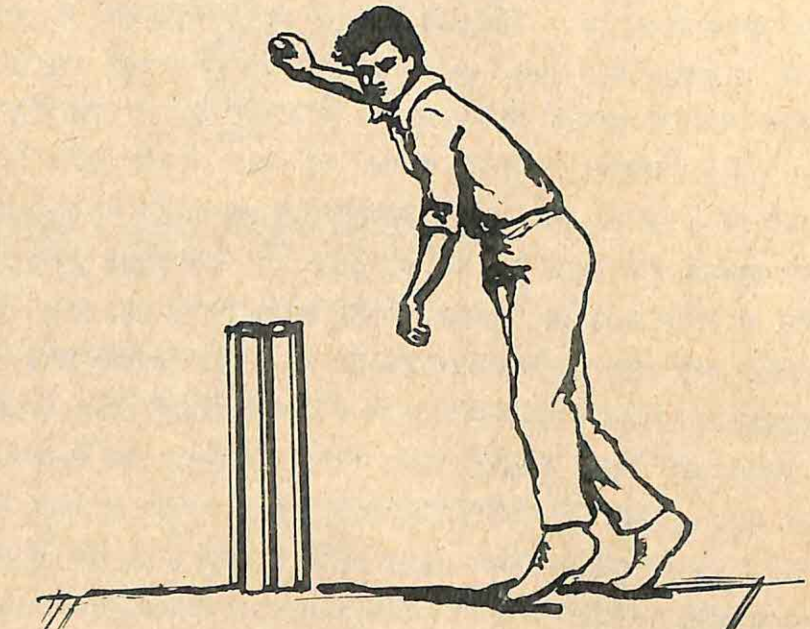
ক্রিকেট আমাকে আমার নাম দিয়েছে। ক্রিকেট ছাড়া আমার নাম বিজয় মার্চেন্ট হতে পারত না, হ'ত বিজয় থ্যাকারসে। থ্যাকারসে আমার

ঠাকুরদার বাবার নাম। আমাদের পরিবারের সকলের পদবীও থ্যাকারসে। মার্চেন্ট নামটা আমি পেয়েছি আমার স্কুল, ভারদা নিউ হাই স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের কাছ থেকে। কারণ, সেই সময় আমাদের পেশা ছিল ব্যবসা। গ্র্যাজুয়েট হবার পরও আমি আমার নাম মার্চেন্ট বদলে থ্যাকারসে করি নি, কারণ ততদিনে আমি চতুর্দলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট খেলেছি এবং আমার মনে হয়েছে, এখন নাম বদলালে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে। সুতরাং দেখতেই পাচ্ছ, ক্রিকেট না হলে আমি বিজয় থ্যাকারসেই থাকতাম।

ক্রিকেট আমাকে যশ দিয়েছে। ক্রিকেটের জন্যই আমি গভীর বন্ধুত্ব লাভ করেছি, বিদেশে যাবার সুযোগ পেয়েছি, এবং অটুট স্বাস্থ্য আর সুঠাম দেহের অধিকারী হয়েছি। ক্রিকেটই আমাকে বুঝতে শিখিয়েছে যে, সাফল্যের আনন্দে আত্মহারা হতে নেই, আবার ব্যর্থতার হতাশায় ভেঙে পড়তে নেই। ক্রিকেটই আমাকে জানতে শিখিয়েছে যে, নিজের কৃতিত্বে কখনও গর্বিত হতে নেই, আবার বিপক্ষের শক্তিকে কখনও খর্ব করে দেখতে নেই। ক্রিকেটই আমাকে দেখিয়েছে যে, শেষ বলটি না হওয়া পর্যন্ত খেলায় কখনও হার হয় না; সুতরাং কখনই হাল ছেড়ে দিও না, একেবারে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও। ক্রিকেট আমাকে নানাবিধ সমস্যার সমাধান করতে শিখিয়েছে, কারণ ক্রিকেটে প্রত্যেকটা বল তার গুণ অনুসারে খেলতে হয়। ক্রিকেট আমাকে আরও শিখিয়েছে যে, তুমি যেমন কখনও বাম্পার অথবা বীমার থেকে পালাও না, ঠিক তেমনি তুমি কখনও জীবনের সমস্যাবলী থেকে পালিয়ে তার সমাধান করতে পারবে না। খেলায় অন্যের ব্যর্থতাকে পুষিয়ে দেবার শিক্ষা দিয়ে ক্রিকেট আমাকে যাঁরা আমার চেয়ে কম ভাগ্যবান্ তাঁদের সাহায্য করতে শিখিয়েছে। এবং পরিশেষে, ক্রিকেট আমাকে জীবনের প্রতি এক খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব এনে দিয়েছে—যে মনোভাব আমি কখনই সাধারণভাবে গড়ে তুলতে পারতাম না।

ক্রিকেটের কাছে আমার এত ঋণ। আমার কাছে ক্রিকেটের কোনো ঋণ নেই। আমি খুবই গর্বিত যে, ক্রিকেটের মাধ্যমে আমি আমার জন্মভূমির

জন্য সামান্য কিছু করতে পেরেছি। এজন্য আমি ক্রিকেটের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আমি গত হবার পর আমার স্মৃতি রক্ষার জন্য কিছু করা হোক তা আমি চাই না। আমার নামে কোনো ট্রফি বা টুর্নামেন্ট হোক তা-ও আমি চাই না। আমি শুধু চাই, একজন সাধারণ ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে স্মরণীয় হতে, যে খেলোয়াড় একটা শ্রেষ্ঠ খেলার মাধ্যমে তার দেশের প্রতি তার ঋণ শোধ করার চেষ্টা করেছে—এবং সেই শ্রেষ্ঠ খেলার নাম ক্রিকেট।



এই সিরিজের অন্যান্য বই

প্রতিটি বই দেড় টাকা

বাপু (১ম ও ২য়)	···	এফ সি ফ্রিটাস অনু : মহাশ্বেতা দেবী
কাশ্মীর	···	মালা সিং অনু : মহাশ্বেতা দেবী
রেড ক্রস কাহিনী	···	কৃষ্ণ সত্যানন্দ অনু : মহাশ্বেতা দেবী
সোনার অভিযান	···	তারা তেওয়ারী অনু : আদিত্য সেন
রূপা নামে হাতিটি	···	মিকি প্যাটেল অনু : আদিত্য সেন
সে অনেক কালের কথা (২য়)	···	এম· চোকসি ও পি, এম· যোশী অনু : এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়
সকলের সাথী সকলের বন্ধু	···	উমাশঙ্কর যোশী অনু : ক্ষিতীশ রায়
ফুল ও মৌমাছি	···	অশোক দাবার অনু : ইন্দ্রাণী সরকার
অযোধ্যার রাজকুমার	···	হংস মেহতা অনু : বুদ্ধদেব ঘোষ
হকি খেলায় ভারত	···	শরদিন্দু সান্যাল অনু : কিষণ চাঁদ বর্মন

ছোটদের দু'টি বই

এশিয়ার রূপকথা	···	অনু : হিমানীশ গোস্বামী ১২ টাকা
ডাক টিকিটের মজার কাহিনী (২য় সং)	···	সত্যপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অনু : নিতাই চট্টোপাধ্যায় ২.৫০ টাকা



National Book Trust, India
REVISED PRICE Rs.5.00

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া